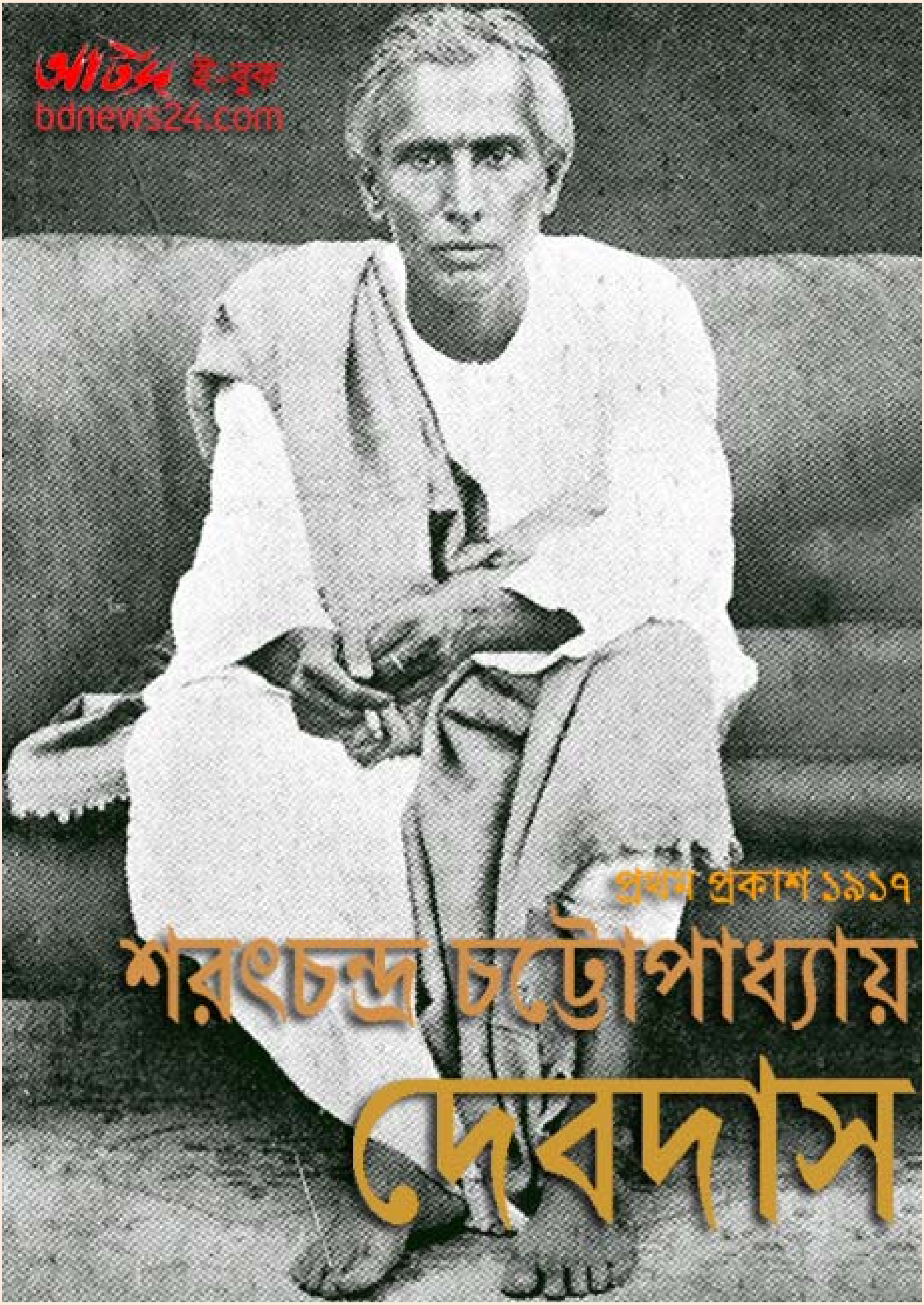

আর্টস ই-বুক
bdnews24.com

প্রথম প্রকাশ ১৯১৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেবদাস

দেবদাস

প্রথম প্রকাশ: ১৯১৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬—১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮)

১৯০১ সালে রচিত হলেও *দেবদাস* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। প্রকাশের পরে পরেই ভারত উপমহাদেশের বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়। শরৎচন্দ্র তখন খ্যাতিমান সাহিত্যিক।

দেবদাস-এর মতো বাংলা ভাষার আর কোন উপন্যাস সিনেমা নির্মাতাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। দেবদাস-এর প্রথম চলচ্চিত্ররূপ ১৯২৮ সালে। এটি ছিলো নির্বাক ছবি। এরপর ১৯৩৫ ও ৩৬ সালে আবার নির্মিত হয়। এ দুটি সবাক। প্রথমটি বাংলায়, দ্বিতীয়টি হিন্দিতে। ১৯৫৫, ২০০২ ও ২০০৯ সালে আবার হিন্দিতে সিনেমা নির্মিত হয়। এ ছাড়া তামিল ও অহমিয়া ভাষায় নির্মিত হয়। বাংলা ভাষায় আরো তিনবার। কোলকাতায় একবার, বাংলাদেশে দুইবার (দুটি-ই চাষী নজরুল ইসলামের, একটি মুক্তির অপেক্ষায়)।

সিনেমার কাহিনী হিসেবে দেবদাস জনপ্রিয় হলেও সাহিত্য আলোচনায় দেবদাসকে খুব একটা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, ১৯৩৫ সালে নির্মিত দেবদাস শরৎচন্দ্র পছন্দ করেননি বলে জানা যায়। দেবদাসের মৃত্যুসংবাদে পার্বতীর উদ্ভ্রান্ত দৌঁড় উপন্যাসে না থাকলেও সিনেমায় ঢোকানো হয়। সিনেমা নির্মাতার তরফে এই 'দৌঁড়'কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি একটি দৃশ্যের মাত্র, কিন্তু চিন্তা উদ্রেককারী।

উপন্যাস হিসেবে দেবদাস নিয়ে আলোচনা খুব পাওয়া না গেলেও সিনেমা নিয়ে বহু আলোচনা আছে। আলোচনার একটা দিক হলো—রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর পুনর্লিখন *দেবদাস*। দেবদাস, পার্বতী ও চন্দ্রমুখী যথাক্রমে কৃষ্ণ, দুর্গা/পার্বতী এবং চন্দ্রমুখী চরিত্রটি মধ্যযুগের রাজস্থানের বৈষ্ণবী মীরা বাঈ (১৪৯৮—১৫৪৭)। মীরা বাঈ-এর বহু ভজন এখনো প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। সমালোচকরা বলছেন, দেবদাস চরিত্রের

নিষ্ঠুরতা ও দুষ্টামির উৎস কৃষ্ণ চরিত্র। দেবদাস-পার্বতীর মিলন না হওয়া রাধাকৃষ্ণকে প্রবলভাবে সিগনিফাই করে। এবং এই সিগনিফিকেসনের মধ্য দিয়ে বিচ্ছেদকে মিলনের উর্ধ্বে স্থায়ী আসন করে দেয়।

অন্য দিক হলো—শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ে বিশিষ্ট সমাজ সমালোচক সাহিত্যিক হবার পরেও *দেবদাস* আসলে সমাজ ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। কতক সমালোচনা করলেও সমাজের মূলনীতিকে ভাঙেননি শরৎচন্দ্র।

এই সব সমালোচনা এসেছে মূলতঃ দেবদাস সিনেমা থেকে। কিন্তু কোন সিনেমাতেই উপন্যাসের এসেন্সকে রাখা হয়নি। উপন্যাসে দেবদাসের পরিণতির জন্য দায়ী হিসেবে দেবদাসকেই চিহ্নিত করেছেন শরৎচন্দ্র। আর সবগুলি সিনেমাতেই দেবদাস ও তাঁর প্রেমকে সমাজের শিকার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সিনেমায় দেবদাস হিরো, বর্ণপ্রথা এন্টি-হিরো; আর উপন্যাসে দেবদাস নিজেই এন্টি-হিরো। সিনেমায় 'ব্যক্তিক চরিত্রকথা' থেকে 'সামাজিক বৃত্তান্ত'-এ পর্যবসিত *দেবদাস*।

ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচিত বাংলাভাষীর জন্য প্রেম ও প্রেমিক যোগান দিয়েছিলেন শেক্সপিয়র। কিন্তু বিভিন্ন আলোচনা সমালোচনার পরেও বলা যায়, প্রকাশের পর থেকেই বহু বাংলাভাষীর কাছে প্রেমিক ও প্রেমকাহিনী হিসেবে *দেবদাস* শেক্সপিয়রের বেশ কিছু চরিত্রকে হটিয়ে দিয়েছে। একই সাথে প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মপীড়ন, বিচ্ছেদ ও সমাজের কাছে নতির কিছু শিক্ষাও দিয়ে থাকতে পারে *দেবদাস*।

আর্টস ই-বুক সিরিজে এবারে প্রকাশিত হলো শরৎচন্দ্রের *দেবদাস*।

--এস এম রেজাউল করিম।

আর্টস ই বুক
http://arts.bdnews24.com

(bdnews24.com থেকে ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে প্রকাশিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুয্যেদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল; এবং নিমিষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়। উর্বর মস্তিষ্কে একটা উপায়ও গজাইয়া উঠিল। সে শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাঠশালায় এখন টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। বালকের দল নানারূপ ভাবভঙ্গী ও শব্দ-সাড়া করিয়া অনতিদূরের বটবৃক্ষতলে ডাংগুলি খেলিতেছিল। দেবদাস সেদিকে একবার চাহিল। টিফিনের ছুটি সে পায় না—কেননা গোবিন্দ পণ্ডিত অনেকবার দেখিয়াছেন যে, একবার পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করাটা দেবদাস নিতান্ত অপছন্দ করে। তাহার পিতারও নিষেধ ছিল। নানা কারণে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে এই সময়টিতে সে সর্দার-পোড়ো ভুলোর জিম্মায় থাকিবে।

এখন ঘরের মধ্যে শুধু পণ্ডিত মহাশয় দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং সর্দার-পোড়ো ভুলো এক কোণে হাত-পা ভাঙ্গা একখণ্ড বেঞ্চের উপর ছোটখাটো পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কখন বা ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, কখন বা দেবদাস এবং পার্বতীর প্রতি আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল। পার্বতী এই মাস-খানেক হইল পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় সম্ভবত এই

অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার একান্ত মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাই সে নিবিষ্ট মনে, নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত সুপ্ত পণ্ডিতের প্রতিকৃতি বোধোদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়া লিখিতেছিল এবং দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় নানাভাবে দেখিতেছিল যে, তাহার বহু যত্নের চিত্রটি আদর্শের সহিত কতখানি মিলিয়াছে। বেশী যে মিল ছিল তাহা নয়; কিন্তু পার্বতী ইহাতেই যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল।

এই সময় দেবদাস শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভুলোর উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল, অঙ্ক হয় না।
ভুলো শান্ত গম্ভীরমুখে কহিল, কি আঁক?

মণকষা—

শেলেটটা দেখি—

ভাবটা এই যে, তাহার নিকট এ-সব কাজে শ্লেটখানি হাতে পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। দেবদাস তাহার হাতে শ্লেট দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ভুলো ডাকিয়া লিখিতে লাগিল যে, এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে—

এমনি সময়ে একটা ঘটনা ঘটিল। হাত-পা-ভাঙ্গা বেঞ্চখানার উপর সর্দার-পোড়ো তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত আসন নির্বাচন করিয়া যথানিয়মে আজ তিন বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন বসিয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে একরাশি চুন গাদা করা ছিল। এটি পণ্ডিত মহাশয় কবে কোন্‌যুগে নাকি সস্তা দরে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, মানস ছিল, সময় ভাল হইলে ইহাতে কোঠা-দালান দিবেন। কবে যে সে শুভদিন

আসিবে তাহা জানি না। কিন্তু এই শ্বেত-চূর্ণের প্রতি তাঁহার সতর্কতা এবং যত্নের অবধি ছিল না। সংসারানভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে, এইজন্য প্রিয়পাত্র এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভোলানাথ এই সযত্ন-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল এবং তাই সে বেঞ্চের উপর বসিয়া ইহাকে আগুলিয়া থাকিত।

ভোলানাথ লিখিতেছিল—এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে,—ওগো বাবা গো—তাহার পর খুব শব্দ-সাড়া হইল। পার্বতী ভয়ানক উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া হাততালি দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।
সদ্যঃনিদ্রোত্থিত গোবিন্দ পণ্ডিত রক্তনেত্রে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, গাছতলায় ছেলের দল একেবারে সার বাঁধিয়া হৈহৈ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এবং তখনি চক্ষে পড়িল যে, ভগ্ন বেঞ্চের উপর একজোড়া পা নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং চুনের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। চিৎকার করিলেন, কি—কি—কি রে!

বলিবার মধ্যে শুধু পার্বতী ছিল। কিন্তু সে তখন ভূমিতলে লুটাইতেছে এবং করতালি দিতেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের বিফল প্রশ্ন ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া গেল, কি, কি—কি রে!
তাহার পর শ্বেতমূর্তি ভোলানাথ চুন ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় আবার চিৎকার করিলেন, গুয়োটা তুই!—তুই ওর ভেতর!

অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

আবার!

দেবা শালা—ঠেলে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—মণকষা—

আবার গুয়োটা!

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া, মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়েচে?

ভুলো আরো কাঁদিতে লাগিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া চুন ঝাড়াঝাড়ি হইল, কিন্তু সাদা এবং কালো রঙে সর্দার-পোড়োকে কতকটা ভূতের মতো দেখাইতে লাগিল এবং তখনও তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না।

পণ্ডিত বলিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে পালিয়েচে? বটে?

ভুলো বলিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

পণ্ডিত বলিলেন, এর শোধ নেব।

ভুলো কহিল,—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন, ছোঁড়াটা কোথায়—

তাহার পর ছেলেদের দল রক্তমুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দেবাকে ধরা গেল না। উঃ—যে ইঁট ছোঁড়ে—!

ধরা গেল না?

আর একজন বালক পূর্বকথার প্রতিধ্বনি করিল—উঃ—যে—

থাম বেটা—

সে ঢোক গিলিয়া একপাশে সরিয়া গেল। নিষ্ফল-ক্রোধে পণ্ডিতমশাই প্রথমে পার্বতীকে খুব ধমকাইয়া উঠিলেন; তাহার পর ভোলানাথের হাত ধরিয়া কহিলেন, চল্, একবার কাছারিবাড়িতে কর্তাকে বলে আসি।

ইহার অর্থ এই যে, জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের নিকট তাঁহার পুত্রের আচরণের নালিশ করিবেন।

তখন বেলা তিনটা আন্দাজ হইয়াছিল। নারায়ণ মুখুয্যেমশায় বাহিরে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন এবং একজন ভৃত্য হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল। সছাত্র পণ্ডিতের অসময় আগমনে কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, গোবিন্দ যে!

গোবিন্দ জাতিতে কায়স্থ—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভুলোকে দেখাইয়া সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। মুখুয্যেমশায় বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, তাইত,

দেবদাস যে শাসনের বাইরে গেছে দেখচি!

কি করি, আপনি হুকুম করুন।

জমিদারবাবু নলটা রাখিয়া দিয়া কহিলেন, কোথা গেল সে?

তা কি জানি? যারা ধরতে গিয়েছিল, তাদের ইঁট মেরে তাড়িয়েচে।

তাঁহারা দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নারায়ণবাবু বলিলেন, বাড়ি এলে যা হয় করব।

গোবিন্দ ছাত্রের হাত ধরিয়া পাঠশালায় ফিরিয়া গিয়া মুখ ও চোখের ভাব-ভঙ্গীতে সমস্ত পাঠশালা সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবদাসের পিতা সে অঞ্চলের জমিদার হইলেও তাহাকে আর পাঠশালে ঢুকিতে দিবেন না। সেদিন পাঠশালার ছুটি কিছু পূর্বেই হইল; যাইবার সময় ছেলেরা অনেক কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

একজন কহিল, উঃ! দেবা কি ষণ্ডা দেখেচিস!

আর একজন কহিল, ভুলোকে আচ্ছা জব্দ করেচে।

উঃ, কি ঢিল ছোঁড়ে!

আর একজন ভুলোর তরফ হইতে কহিল,—ভুলো শোধ নেবে দেখিস।

ইস্—সে তো আর পাঠশালায় আসবে না যে শোধ নেবে।

এই ক্ষুদ্র দলটির একপাশে পার্বতীও বই-শ্লেট লইয়া বাড়ি আসিতেছিল। সে নিকটবর্তী একজন ছেলের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মণি, দেবদাদাকে আর পাঠশালায় সত্যি আসতে দেবে না?

মণি বলিল, না—কিছুতেই না।

পার্বতী সরিয়া গেল—কথাটা তার বরাবরই ভাল লাগে নাই।

পার্বতীর পিতার নাম নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী। চক্রবর্তী মহাশয় জমিদারদের প্রতিবেশী অর্থাৎ মুখুয্যে মহাশয়ের খুব বড় বাড়ির পার্শ্বে তাঁহার ছোট এবং পুরাতন সেকেলে ইঁটের বাড়ি। তাঁহার দু-দশ বিঘা জমিজমা আছে, দু'-চার ঘর যজমান আছে, জমিদারবাড়ির আশা-প্রত্যাশাটা আছে,—বেশ স্বচ্ছন্দ পরিবার—বেশ দিন কাটে।

প্রথমে ধর্মদাসের সহিত পার্বতীর সাক্ষাৎ হইল। সে দেবদাসের বাটীর ভৃত্য। এক বৎসর বয়স হইতে আজ দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত তাহাকে লইয়াই আছে—পাঠশালায় পৌঁছিয়া দিয়া আসে এবং ছুটির সময় সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরাইয়া আনে। এ কাজটি সে যথানিয়মে প্রত্যহ করিয়াছে এবং আজিও সেইজন্যই পাঠশালায় যাইতেছিল। পার্বতীকে দেখিয়া কহিল, কৈ পারু, তোর দেবদাদা কোথায়?
পালিয়ে গেছে—

ধর্ম্মদাস ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া বলিল, পালিয়ে গেছে কি রে?

তখন পার্বতী ভোলানাথের দুর্দশার কথা মনে করিয়া আবার নূতন করিয়া হাসিতে শুরু করিল,—দেখ্‌ধন্ম, দেবদা—হি হি হি—একেবারে চুনের গাদায়—হি হি—হু হু—একেবারে ধন্ম চিৎ করে—

ধর্ম্মদাস সব কথা বুঝিতে না পারিলেও হাসি দেখিয়া খানিকটা হাসিয়া লইল; পরে হাস্য সংবরণ করিয়া জিদ করিয়া কহিল, বল না পারু, কি হয়েচে?

দেবদা ঠেলে ফেলে দিয়ে—ভুলোকে—চুনের গাদায়—হি হি হি—

ধর্ম্মদাস এবার বাকিটা বুঝিয়া লইল এবং অতিশয় চিন্তিত হইল; বলিল, পারু সে এখন কোথায় আছে জানিস?

আমি কি জানি!

তুই জানিস—বলে দে। আহা তার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েচে।

তা তো পেয়েচে—আমি কিন্তু বলব না।

কেন বলবি নে?

বললে আমাকে বড় মারবে। আমি খাবার দিয়ে আসব।

ধর্মদাস কতকটা সন্তুষ্ট হইল—কহিল, তা দিয়ে আসিস, আর সন্ধ্যের আগে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি ডেকে আনিস।

আনব।

বাটীতে আসিয়া পার্বতী দেখিল, তাহার মা এবং দেবদাসের মা উভয়েই সব কথা শুনিয়াছেন। তাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করা হইল। হাসিয়া গম্ভীর হইয়া সে যতটা পারিল কহিল। তাহার পর আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া জমিদারদের একটা আমবাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। বাগানটা তাহাদেরই বাটীর নিকটে, এবং ইহারই একান্তে একটা বাঁশঝাড় ছিল। সে জানিত, লুকাইয়া তামাক খাইবার জন্য দেবদাস এই বাঁশঝাড়ের মধ্যে কতকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। পলাইয়া লুকাইয়া থাকিতে হইলে ইহাই তাহার গুপ্তস্থান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া পার্বতী দেখিল, বাঁশঝোপের মধ্যে দেবদাস ছোট একটা হুঁকা হাতে বসিয়া আছে এবং বিজ্ঞের মতো ধূমপান করিতেছে। মুখখানা বড় গম্ভীর—যথেষ্ট দুর্ভাবনার চিহ্ন তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া সে খুব খুশী হইল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিল না। তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবেই কহিল, আয়।

পার্বতী কাছে আসিয়া বসিল। আঁচলে যাহা বাঁধা ছিল, তৎক্ষণাৎ দেবদাসের চক্ষে পড়িল। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে তাহা খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া কহিল, পারু, পণ্ডিতমশাই কি বললে রে?

জ্যাঠামশায়ের কাছে বলে দিয়েচে।

দেবদাস হুঁকা নামাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বাবাকে বলে দিয়েচে?

হাঁ।

তারপর?

তোমাকে আর পাঠশালায় যেতে দেবে না।

আমি পড়তেও চাই না।

এই সময়ে তাহার খাদ্যদ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দেবদাস পার্বতীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, সন্দেশ দে।

সন্দেশ তো আনিনি।

তবে জল দে।

জল কোথায় পাব?

বিরক্ত হইয়া দেবদাস কহিল, কিছুই নেই, তো এসেচিস কেন? যা, জল নিয়ে আয়।

তাহার রুক্ষস্বর পার্বতীর ভাল লাগিল না; কহিল, আমি আবার যেতে পারিনে—তুমি খেয়ে আসবে চল।

আমি কি এখন যেতে পারি?

তবে কি এইখানেই থাকবে?

এইখানে থাকব, তারপর চলে যাব—

পার্বতীর মনটা খারাপ হইয়া গেল। দেবদাসের আপাত-বৈরাগ্য দেখিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল,—কহিল, দেবদা, আমিও যাব।

কোথায়? আমার সঙ্গে? দূর—তা কি হয়?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, যাবই—

না,—যেতে হবে না—তুই আগে জল নিয়ে আয়—

পার্বতী আবার মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি যাবই—

আগে জল নিয়ে আয়—

আমি যাব না—তুমি তা হলে পালিয়ে যাবে।

না—যাব না।

কিন্তু পার্বতী কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাই বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় হুকুম করিল, যা বলচি।

আমি যেতে পারব না।

রাগ করিয়া দেবদাস পার্বতীর চুল ধরিয়া টান দিয়া ধমক দিল—যা বলচি।

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তারপর তাহার পিঠে একটা কিল পড়িল—যাবিনে?

পার্বতী কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কিছুতেই যাব না।

দেবদাস একদিকে চলিয়া গেল। পার্বতীও কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে দেবদাসের পিতার সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখুয্যেমশাই পার্বতীকে বড় ভালবাসিতেন। বলিলেন, পারু, কাঁদচিস কেন মা?

দেবদা মেরেচে।

কোথায় সে?

ঐ বাঁশবাগানে বসে তামাক খাচ্ছিল।

একে পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন হইতেই তিনি চটিয়া বসিয়া ছিলেন—এখন এই সংবাদটা তাঁহাকে একেবারে অগ্নিমূর্তি করিয়া দিল। বলিলেন, দেবা বুঝি আবার

তামাক খায়?

হাঁ খায়, রোজ খায়। বাঁশবাগানে তার হুঁকো নুকোন আছে—

এতদিন আমাকে বলিসনি কেন?

দেবদাদা মারবে বলে।

কথাটা কিন্তু ঠিক তাই নহে। প্রকাশ করিলে দেবদাস পাছে শাস্তি ভোগ করে, এই ভয়ে সে কোন কথা বলে নাই। আজ কথাটা শুধু রাগের মাথায় বলিয়া দিয়াছে। এই তাহার সবে আট বৎসরমাত্র বয়স—রাগ এখন বড় বেশী; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা নিতান্ত কম ছিল না। বাড়ি গিয়া বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া ঘুমাইয়া পড়িল,—সে রাত্রে ভাত পর্যন্ত খাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবদাসকে পরদিন খুব মারধর করা হইল,—সমস্তদিন ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহার পর, তাহার জননী যখন ভারী কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন দেবদাসকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।পরদিন ভোরবেলায় সে পলাইয়া আসিয়া পার্বতীর ঘরের জানালার নিকট দাঁড়াইল—ডাকিল, পারু! আবার ডাকিল, পারু!

পার্বতী জানালা খুলিয়া কহিল, দেবদা!

দেবদাস ইশারা করিয়া বলিল, শিগগির আয়। দু'জনে একত্র হইলে দেবদাস বলিল, তামাক খাবার কথা বলে দিলি কেন?

তুমি মারলে কেন?

তুই জল আনতে গেলি না কেন?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

দেবদাস বলিল, তুই বড় গাধা—আর যেন বলে দিসনে।

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।
তবে চল্, ছিপ কেটে আনি। আজ বাঁধে মাছ ধরতে হবে।

বাঁশঝাড়ের নিকট একটা নোনা গাছ ছিল, দেবদাস তাহাতে উঠিয়া পড়িল। বহুকষ্টে একটা বাঁশের ডগা নোয়াইয়া পার্বতীকে ধরিতে দিয়া কহিল, দেখিস যেন ছেড়ে দিসনে, তা হলে পড়ে যাব।

পার্বতী প্রাণপণে টানিয়া ধরিয়া রহিল। দেবদাস সেইটা ধরিয়া একটা নোনাডালে পা রাখিয়া, ছিপ কাটিতে লাগিল। পার্বতী নীচে হইতে কহিল, দেবদা, পাঠশালে যাবে না?

না।

জ্যাঠামশাই তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

বাবা আপনি বলেচেন, আমি আর ওখানে পড়ব না। বাড়িতে পণ্ডিত আসবে।

পার্বতী একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। পরে বলিল, কাল থেকে গরমের জন্য আমাদের সকালবেলা পাঠশালা বসে, আমি এখনি যাব।

দেবদাস উপর হইতে চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, না, যেতে হবে না।

এই সময়ে পার্বতী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল,—অমনি বাঁশের ডগা উপরে উঠিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবদাস নোনাডাল হইতে নীচে পড়িয়া গেল। বেশী উঁচু ছিল না বলিয়া তেমন লাগিল না, কিন্তু গায়ে অনেক স্থানে ছড়িয়া গেল। নীচে আসিয়া ক্রুদ্ধ দেবদাস একটা শুষ্ক কঞ্চি তুলিয়া লইয়া পার্বতীর পিঠের উপর, গালের উপর, যেখানে-সেখানে সজোরে ঘা-কতক বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, দূর

হয়ে যা।

প্রথমে পার্বতী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু যখন ছড়ির পর ছড়ি ক্রমাগত পড়িতে লাগিল, তখন সে ক্রোধে ও অভিমানে চক্ষু দুটি আগুনের মতো করিয়া কাঁদিয়া বলিল, এই আমি জ্যাঠামশায়ের কাছে যাচ্ছি—

দেবদাস রাগিয়া আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, এখনি বলে দিগে যা—বয়ে গেল।

পার্বতী চলিয়া গেল। যখন অনেকটা গিয়াছে, তখন দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী শুনিয়াও শুনিল না—আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। দেবদাস আবার ডাকিল, ও পারু, শুনে যা না!

পার্বতী জবাব দিল না। দেবদাস বিরক্ত হইয়া, কতকটা চিৎকার করিয়া, কতকটা আপনার মনে বলিল, যাক—মরুক গে।

পার্বতী চলিয়া গেলে, দেবদাস যেমন-তেমন করিয়া দুই-একটা ছিপ কাটিয়া লইল। তাহার মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাহার গালের উপর ছড়ির দাগ নীল হইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে। প্রথমেই ঠাকুরমার চক্ষে পড়িল।

তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—ওগো, মা গো, কে এমন করে মারলে পারু?

চোখ মুছিতে মুছিতে পার্বতী কহিল, পণ্ডিতমশাই।

ঠাকুরমা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, চল তো, একবার নারাণের কাছে যাই, দেখি সে কেমন পণ্ডিত! আহা—বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেচে!

পার্বতী পিতামহীর গলা জড়াইয়া কহিল, চল।

মুখুয্যে মহাশয়ের নিকট আসিয়া পিতামহী পণ্ডিত মহাশয়ের অনেকগুলি পুরুষের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের পারলৌকিক অশুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং খাদ্যদ্রব্যেরও তেমন ভাল ব্যবস্থা করিলেন না। শেষে স্বয়ং গোবিন্দকে নানামতে গালি পাড়িয়া বলিলেন, নারাণ, দেখ তো মিনসের আস্পর্ধা! শুদ্দুর হয়ে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তোলে! কি করে মেরেচে একবার দেখ। বলিয়া গালের উপর নীল দাগগুলা বৃদ্ধা অত্যন্ত বেদনার সহিত দেখাইতে লাগিলেন।

নারায়ণবাবু তখন পার্বতীকেই প্রশ্ন করিলেন, কে মেরেচে পারু?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তখন ঠাকুরমাই আর একবার চিৎকার করিয়া বলিলেন, আবার কে! ঐ গোঁয়ার পণ্ডিতটা।

কেন মারলে?

পার্বতী এবারও কথা কহিল না। মুখুয্যেমশাই বুঝিলেন, কোন দোষ করার জন্য মার খাইয়াছে—কিন্তু এরূপ আঘাত করা উচিত হয় নাই, প্রকাশ করিয়া তাহাই বলিলেন। শুনিয়া পার্বতী পিঠ খুলিয়া বলিল, এখানেও মেরেচে।

পিঠের দাগগুলা আরও স্পষ্ট, আরো গুরুতর। তাই দু'জনেই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া কৈফিয়ত তলব করিবেন, মুখুয্যে মহাশয় এরূপ অভিসন্ধিও প্রকাশ করিলেন; এবং স্থির হইল যে, এরূপ পণ্ডিতের নিকট ছেলেমেয়ে পাঠান উচিত নহে।

রায় শুনিয়া পার্বতী খুশি হইয়া ঠাকুরমার কোলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাটীতে পৌঁছিয়া পার্বতী জননীর জেরায় পড়িল। তিনি ধরিয়া বসিলেন, কেন মেরেচে বল্?

পার্বতী বলিল, মিছিমিছি মেরেচে।

জননী কন্যার খুব করিয়া কান মলিয়া দিয়া বলিলেন, মিছিমিছি কেউ কখন মারে?

দালান দিয়া সেই সময়ে শাশুড়ি যাইতেছিলেন, তিনি ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বলিলেন, বৌমা, মা হয়ে তুমি মিছিমিছি মারতে পার, আর সে মুখপোড়া পারে না?

বৌমা বলিল, শুধু-শুধু কখনো মারেনি। যে শান্ত মেয়ে—কি করেচে, তাই মার খেয়েচে।

শাশুড়ি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাই না হয় হলো, কিন্তু ওকে আর আমি পাঠশালে যেতে দেব না।

একটু লেখাপড়া শিখবে না!

কি হবে বৌমা? একটা-আধটা চিঠিপত্র লিখতে পারলে, দু'ছত্র রামায়ণ-মহাভারত পড়তে শিখলেই ঢের। পারু কি তোমার জজিয়তি করবে, না উকিল হবে?

বৌমা অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। সেদিন দেবদাস বড় ভয়ে-ভয়েই বাড়িতে প্রবেশ করিল। পার্বতী যে ইতিমধ্যে সমস্তই বলিয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু বাড়ি আসিয়া যখন তাহার অণুমাত্র আভাসও প্রকাশ পাইল না, বরঞ্চ মায়ের কাছে শুনিতে পাইল—আজ গোবিন্দ পণ্ডিত পার্বতীকেও অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে, তাই আর সে পাঠশালায় যাইবে না—তখন আনন্দের আতিশয্যে তাহার ভাল করিয়া আহার করাই হইল না; কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া পার্বতীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, তুই আর পাঠশালে যাবিনে?

না।

কি করে হল রে?

আমি বললুম, পণ্ডিতমশায় মেরেচে।

দেবদাস খুব একগাল হাসিয়া, তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া, মত প্রকাশ করিল যে, তাহার মতো বুদ্ধিমতী এ পৃথিবীতে আর নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সে পার্বতীর গালের নীল দাগগুলি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আহা!

পার্বতী একটু হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি?

বড় লেগেচে, না রে পারু?

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ।

আহা, কেন অমন করিস, তাই তো রাগ হয়—তাই তো মারি।

পার্বতীর চোখে জল আসিল; মনে ভাবিল—জিজ্ঞাসা করে, কি করি? কিন্তু পারিল না।

দেবদাস তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আর অমন করো না, কেমন?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দেবদাস আর একবার তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা—আর কখনও তোকে আমি মারব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন যায়—এ দুটি বালক-বালিকার আমোদের সীমা নেই—সমস্ত দিন ধরিয়া রোদে রোদে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া মারধর খায়,আবার সকালবেলায় ছুটিয়া পলাইয়া যায়—আবার তিরস্কার-প্রহার ভোগ করে। রাত্রে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়; আবার সকাল হয়, আবার পলাইয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। অন্য সঙ্গীসাথী বড় কেহ নাই, প্রয়োজনও হয় না। পাড়াময় অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট। সেদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরেই দুইজনে বাঁধে গিয়া নামিয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহরে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, সমস্ত জল ঘোলা করিয়া, পনরটা পুঁটিমাছ ধরিয়া যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। পার্বতীর জননী কন্যাকে রীতিমত প্রহার করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দেবদাসের কথা ঠিক জানি না; কেননা এ-সব কাহিনী সে কিছুতেই প্রকাশ করে না। তবে পার্বতী যখন ঘরে বসিয়া খুব করিয়া কাঁদিতেছিল, তখন—বেলা দুইটা-আড়াইটার সময়, একবার জানালার নীচে আসিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়াছিল, পারু, ও পারু! পার্বতী বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু রাগ করিয়া উত্তর দেয় নাই। তাহার পর সমস্ত দিনটা সে অদূরবর্তী একটা চাঁপা গাছে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল; এবং সন্ধ্যার পর বহু পরিশ্রমে ধর্মদাস তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

তবে শুধু সেই দিনটা মাত্র। পরদিন পার্বতী সকালবেলা হইতে দেবদাদার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল, কিন্তু দেবদাস আসিল না—সে পিতার সহিত নিকটবর্তী গ্রামে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল। দেবদাস যখন আসিল না, পার্বতী তখন ক্ষুণ্ণমনে একাকী বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। কাল বাঁধে নামিবার সময় দেবদাস তিনটা টাকা

পার্বতীকে রাখিতে দিয়াছিল—পাছে হারাইয়া যায়। আঁচলে সে টাকা তিনটা বাঁধা ছিল। সে আঁচল ঘুরাইয়া, নিজে ঘুরিয়া বহুক্ষণ একা কাটাইয়া দিল।সঙ্গীসাথী কেহ মিলিল না; কেননা তখন সকালবেলায় পাঠশালা বসে। পার্বতী তখন ওপাড়ায় চলিল। সেখানে মনোরমাদের বাড়ি। মনোরমা পাঠশালে পড়ে, বয়সে কিছু বড়, কিন্তু পারুর বন্ধু। অনেকদিন দেখাশুনা হয় নাই।

আজ সময় পাইয়া পার্বতী ওপাড়ায় তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, মনো—বাড়ি আছিস?

মনোরমার পিসীমা বাহিরে আসিলেন।

পারু?

হ্যাঁ,—মনো কোথায় পিসীমা?

সে তো পাঠশালায় গেছে—তুমি যাওনি?

আমি পাঠশালায় যাইনি—দেবদাও যায় না।

মনোরমার পিসীমাতা হাসিয়া কহিলেন, তবে তো ভাল! তুমিও যাও না, দেবদাদাও যায় না?

না। আমরা কেউ যাইনে।

সে ভাল কথা; কিন্তু মনো পাঠশালায় গেছে।

পিসীমা বসিতে বলিলেন, কিন্তু পার্বতী ফিরিয়া আসিল। পথে রসিক পালের দোকানের কাছে তিনজন বৈষ্ণবী রসকলি পরিয়া খঞ্জনী-হাতে ভিক্ষায় চলিয়াছিল, পার্বতী তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, ও বোষ্টমী! তোমরা গান করতে জান?

একজন ফিরিয়া চাহিল—জানি বৈ কি বাছা!

তবে গাও না।

তখন তিনজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইল। একজন কহিল, অমনি কি গান হয় মা, ভিক্ষে দিতে হয়। চল, তোমাদের বাড়ি গিয়ে গাব।

না, এইখানে গাও।

পয়সা দিতে হয় যে মা!

পার্বতী আঁচল দেখাইয়া কহিল, পয়সা নেই—টাকা আছে।

আঁচলে বাঁধা টাকা দেখিয়া তাহারা দোকান হইতে একটু দূরে গিয়া বসিল। তাহার পর খঞ্জনী বাজাইয়া তিনজনে গলা মিলাইয়া গান ধরিল। কি গান হইল, কি তাহার অর্থ—পার্বতী এ-সব কিছুই বুঝিল না। ইচ্ছা করিলেও হয়ত বুঝিতে পারিত না। কিন্তু মনটি তাহার সেই নিমেষে দেবদাদার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল।

গান শেষ করিয়া তাহারা কহিল, কৈ, কি ভিক্ষে দেবে দাও তো মা !

পার্বতী আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া টাকা তিনটা তাহাদের হাতে দিল। তিনজনেই অবাক হইয়া তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

একজন বলিল, কার টাকা বাছা?

দেবদাদার।

সে তোমাকে মারবে না?

পার্বতী একটু ভাবিয়া কহিল, না।

একজন কহিল, বেঁচে থাক মা!

পার্বতী হাসিয়া কহিল, তোমাদের তিনজনের বেশ ভাগে মিলেচে, না গো?

তিনজনেই মাথা নাড়িয়া বলিল, তা মিলেচে। রাধারানী তোমার ভাল করুন। বলিয়া তাহারা আন্তরিক আশীর্বাদ করিয়া গেল, যেন এই দানশীলা ছোট মেয়েটি শাস্তি ভোগ না করে। পার্বতী সেদিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল। পরদিন সকালবেলাই দেবদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। তার হাতে একটা লাটাই ছিল—তবে ঘুড়ি নাই, সেইটা কিনিতে হইবে। পার্বতীকে কাছে পাইয়া কহিল, পারু, টাকা দে।

পার্বতীর মুখ শুকাইল,—বলিল, টাকা নেই!

কি হল?

বোষ্টমীদের দিয়ে দিয়েচি। তারা গান গেয়েছিল।

সব দিয়ে দিয়েচিস?

সব। তিনটি টাকা তো ছিল।

দূর গাধা, সব বুঝি দিতে হয়!

বাঃ! তারা যে তিনজন ছিল! তিন টাকা না দিলে তিনজনের কি ভাগে মেলে?

দেবদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি হলে দুই টাকা দিতুম, বলিয়া সে লাটাইয়ের বাঁট দিয়া মাটির উপর আঁচড় কাটিয়া কহিল, তা হলে তারা দশ আনা তের গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি করে ভাগে পেত।

পার্বতী ভাবিয়া কহিল, তারা কি তোমার মতো আঁক কষতে জানে?

দেবদাস মণকষা পর্যন্ত পড়িয়াছিল; পার্বতীর কথাটায় খুশী হইয়া কহিল, তা বটে!

পার্বতী দেবদাসের হাত ধরিয়া বলিল, আমি ভেবেছিলুম তুমি আমাকে মারবে, দেবদা।

দেবদাস বিস্মিত হইল—মারব কেন?

বোষ্টমীরা বলেছিল, তুমি আমাকে মারবে।

কথা শুনিয়া দেবদাস মহা খুশী হইয়া পার্বতীর কাঁধের উপর ভর দিয়া কহিল, দূর—না দোষ করলে কি আমি মারি?

দেবদাস বোধ হয় মনে করিয়াছিল যে, পার্বতীর এ কাজটা তাহার পিনাল কোডের ভিতরে পড়ে না; কেননা, তিন টাকা তিনজনে বেশ ভাগ করিয়া লইতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ, যে বোষ্টমীরা পাঠশালায় মণকষা পর্যন্ত পড়ে নাই তাহাদিগকে তিন টাকার বদলে দুই টাকা দিলে, তাহাদের প্রতি কতকটা অত্যাচার করা হইত। তাহার পর সে পার্বতীর হাত ধরিয়া ঘুড়ি কিনিবার জন্য ছোট বাজারের দিকে চলিল,—লাটাইটা সেইখানেই একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিল বটে, কিন্তু আর কাটিতে চাহে না। দেবদাসের জননী বড় গোলযোগ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেবা যে মুখ্যু চাষা হয়ে গেল,—একটা যা হয় উপায় কর।

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, দেবা কলকাতায় যাক। নগেনের বাসায় থেকে বেশ পড়াশুনা করতে পারবে।

নগেনবাবু সম্পর্কে দেবদাসের মাতুল হইতেন। কথাটা সবাই শুনিল। পার্বতী শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিল। দেবদাসকে একা পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিল, দেবদা, তুমি বুঝি কলকাতা যাবে?

কে বললে?

জেঠামশাই বলেচেন।

দূর—আমি কিছুতে যাব না।

আর যদি জোর করে পাঠিয়ে দেন?

জোর?

দেবদাস এই সময় এমন একটা মুখের ভাব করিল, যাহাতে পার্বতী বেশ বুঝিল যে, জোর করিয়া কোন কাজ তাহাকে দিয়া করাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ নাই। সেও তো তাহাই চায়। অতএব, নিরতিশয় আনন্দে আর একবার তাহার হাত ধরিয়া, আর একবার ঝুলিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়া মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, দেখো, যেন যেয়ো না দেবদা।

কখ্‌খন না—

এ প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাহার রহিল না। তাহার পিতা রীতিমতো বকাঝকা করিয়া, এমন কি তিরস্কার ও প্রহার করিয়া ধর্মদাসকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার দিন দেবদাস মনের মধ্যে বড় ক্লেশ অনুভব করিল; নূতন স্থানে যাইতেছে বলিয়া তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল বা আনন্দ হইল না। পার্বতী সেদিন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। কত কান্নাকাটি করিল, কিন্তু কে তাহার কথা শুনিবে? প্রথমে অভিমানে কিছুক্ষণ দেবদাসের সহিত কথা কহিল না; কিন্তু শেষে যখন দেবদাস ডাকিয়া বলিল, পারু আবার শিগগির আসব; যদি না পাঠিয়ে দেয় তো পালিয়ে আসব।

তখন পার্বতী প্রকৃতিস্থা হইয়া নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনেক কথা কহিয়া শুনাইল। তাহার পর সে ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া, পোর্টমান্টো লইয়া, জননীর আশীর্বাদ ও চক্ষের জলের শেষ বিন্দুটি কপালে টিপের মতো পরিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

তখন পার্বতীর কত কষ্ট হইল; কত চোখের জলের ধারা গাল বহিয়া নীচে পড়িতে

লাগিল; কত অভিমানে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিন তাহার এইরূপে কাটিল।

তাহার পর হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিতে পাইল, সমস্তদিনের জন্য তাহার কিছুই করিবার নাই। ইতিপূর্বে পাঠশালা ছাড়িয়া অবধি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু গোলমালে, হুজুগে কাটিয়া যাইত; কত কি যেন তাহার করিবার আছে,—শুধু সময়ে কুলাইয়া উঠে না। এখন অনেক সময়, কিন্তু এতটুকু কাজ খুঁজিয়া পায় না। সকালবেলা উঠিয়া কোনদিন চিঠি লিখিতে বসে। বেলা দশটা বাজিয়া যায়, জননী বিরক্ত হইয়া উঠেন; পিতামহী শুনিয়া বলেন, আহা, তা লিখুক। সকালবেলা ছুটোছুটি না করিয়া লেখাপড়া করা ভাল।

আবার যেদিন দেবদাসের পত্র আইসে, সেদিনটি পার্বতীর বড় সুখের দিন। সিঁড়ির দ্বারে চৌকাঠের উপর কাগজখানি হাতে লইয়া সারাদিন তাহাই পড়িতে থাকে। শেষে মাস-দুই অতিবাহিত হইয়া গেল। পত্র লেখা কিংবা পাওয়া আর তত ঘন ঘন হয় না; উৎসাহটা যেন কিছু কিছু কমিয়া আসিয়াছে।

একদিন পার্বতী সকালবেলায় জননীকে বলিল, মা, আমি আবার পাঠশালায় যাব।

কেন রে? তিনি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমি নিশ্চয় যাব।

তা যাস্। পাঠশালা যেতে আমি আর কবে তোকে মানা করেচি মা?

সেইদিন দ্বিপ্রহরে পার্বতী দাসীর হাত ধরিয়া, বহুদিন-পরিত্যক্ত শ্লেট ও বইখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সেই পুরাতন স্থানে গিয়া শান্ত, ধীরভাবে উপবেশন করিল।

দাসী কহিল, গুরুমশাই, পারুকে আর মারধর করো না; আপনার ইচ্ছায় পড়তে এসেছে। যখন তার ইচ্ছে হবে পড়বে, যখন ইচ্ছা হবে না বাড়ি চলে যাবে।

পণ্ডিত মহাশয় মনে মনে কহিলেন, তথাস্তু। মুখে বলিলেন, তাই হবে।

একবার তাঁহার এমন ইচ্ছাও হইয়াছিল যে জিজ্ঞাসা করেন, পার্বতীকেও কেন কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল না। কিন্তু সেকথা কহিলেন না। পার্বতী দেখিল, সেইখানে সেই বেঞ্চের উপরেই সর্দার-পোড়ো ভুলো বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে একবার হাসি আসিবার মতো হইল, কিন্তু পরক্ষণেই চোখে জল আসিল। তাহার পর তাহার ভুলোর উপর বড় রাগ হইল। মনে হইল, যেন সে-ই শুধু দেবদাসকে গৃহছাড়া করিয়াছে। এমন করিয়াও অনেক দিন কাটিয়া গেল।

অনেক দিনের পর দেবদাস বাটী ফিরিয়া আসিল। পার্বতী কাছে ছুটিয়া আসিল—অনেক কথাবার্তা হইল। তাহার বেশী কিছু বলিবার ছিল না,—থাকিলেও বলিতে পারিল না। কিন্তু দেবদাস অনেক কথা কহিল। সমস্তই প্রায় কলিকাতার কথা। তাহার পর, একদিন গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইল। দেবদাস আবার কলিকাতায় চলিয়া গেল। এবারও কান্নাকাটি হইল বটে, কিন্তু সেবারের মতো তাহাতে তেমন গভীরতা রহিল না। এমনি করিয়া চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এই কয় বৎসরে দেবদাসের স্বভাবের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, দেখিয়া পার্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেকবার চক্ষু মুছিল। ইতিপূর্বে দেবদাসের যে-সমস্ত গ্রাম্যতা-দোষ ছিল, শহরে বাস করিয়া সে-সব আর একেবারে নাই। এখন তাহার বিলাতী জুতা, ভাল জামা, কাপড়, ছড়ি, সোনার ঘড়ি-

চেন, বোতাম—এ-সব না হইলে বড় লজ্জা করে। গ্রামে নদীতীরে বেড়াইতে আর সাধ যায় না; বরং তাহার পরিবর্তে বন্দুক-হাতে শিকারে বাহির হইতেই আনন্দ পায়। ক্ষুদ্র পুঁটিমাছ ধরার বদলে বড় মাছ খেলাইতে ইচ্ছা হয়। শুধু কি তাই? সমাজের কথা, রাজনীতির চর্চা, সভা-সমিতি—ক্রিকেট, ফুটবলের আলোচনা। হায় রে! কোথায় সেই পার্বতী, আর তাহাদের সেই তালসোনাপুর গ্রাম! বাল্যস্মৃতিজড়িত দুই-একটা সুখের কথা যে এখন আর মনে পড়ে না, তাহা নয়—কিন্তু নানা কাজের উৎসাহে সে-সকল আর বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পায় না।

আবার গ্রীষ্মের ছুটি হইল। পূর্ব বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে দেবদাস বিদেশ বেড়াইতে গিয়াছিল, বাটী যায় নাই। এবার পিতা-মাতা উভয়েই জিদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাই ইচ্ছা না থাকিলেও দেবদাস বিছানাপত্র বাঁধিয়া তালসোনাপুর গ্রামের জন্য হাওড়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেদিন বাটী আসিল, সেদিন তাহার শরীর তেমন ভাল ছিল না, তাই বাহির হইতে পারিল না। পরদিন পার্বতীদের বাটীতে আসিয়া ডাকিল, খুড়ীমা!

পার্বতীর জননী আদর করিয়া ডাকিলেন, এস বাবা, বস।

খুড়ীমার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, পারু কোথায় খুড়ীমা?

ঐ বুঝি ওপরের ঘরে আছে।

দেবদাস উপরে আসিয়া দেখিল, পার্বতী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেছে; ডাকিল, পারু!

প্রথমে পার্বতী চমকিত হইয়া উঠিল, তারপর প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কি হচ্ছে পারু?

সে-কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই—তাই পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তারপর, দেবদাসের লজ্জা করিতে লাগিল—কহিল, যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেল। শরীরটা ভাল নয়।

দেবদাস চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পার্বতী এই তের বছরে পা দিয়াছে—ঠাকুরমাতা এই কথা বলেন। এই বয়সে শারীরিক সৌন্দর্য অকস্মাৎ যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কিশোরীর সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলে। আত্মীয়-স্বজন হঠাৎ একদিন চমকিত হইয়া দেখিতে পান যে, তাঁহাদের ছোট মেয়েটি বড় হইয়াছে। তখন পাত্রস্থা করিবার জন্য বড় তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়। চক্রবর্তী-বাড়িতে আজ কয়েক দিবস হইতেই সেই কথার আলোচনা হইতেছে। জননী বড় বিষণ্ণ; কথায় কথায় স্বামীকে শুনাইয়া বলেন, তাইত, পারুকে আর তো রাখা যায় না। তাঁহারা বড়লোক নহেন; তবে ভরসা এই যে, মেয়েটি অতিশয় সুশ্রী। জগতে রূপের যদি মর্যাদা থাকে, তো পার্বতীর জন্য ভাবিতে হইবে না। আরও একটা কথা আছে—সেটা এইখানেই বলিয়া রাখি। চক্রবর্তী-পরিবারে ইতিপূর্বে কন্যার বিবাহে এতটুকু চিন্তা করিতে হইত না, পুত্রের বিবাহে করিতে হইত। কন্যার বিবাহে পণ গ্রহণ করিতেন এবং পুত্রের বিবাহে পণ দিয়া মেয়ে ঘরে আনিতেন। নীলকণ্ঠের পিতাও তাঁহার কন্যার বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ স্বয়ং এ-প্রথাটাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, পার্বতীকে বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ করিবেন। পার্বতীর জননী এ-কথা জানিতেন; তাই স্বামীকে কন্যার জন্য তাগাদা করিতেন। ইতিপূর্বে পার্বতীর জননী মনে মনে একটা দুরাশাকে স্থান দিয়াছিলেন—ভাবিয়াছিলেন, দেবদাসের সহিত যদি কোন সূত্রে কন্যার বিবাহ ঘটাইতে পারেন। এ আশা যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা মনে হইত না। ভাবিলেন, দেবদাসকে অনুরোধ করিলে বোধ হয় কোন সুরাহা হইতে পারে। তাই বোধ হয় নীলকণ্ঠের জননী কথায় কথায় দেবদাসের মাতার কাছে কথাটা এইরূপে পাড়িয়াছিলেন—আহা বৌমা, দেবদাসে আর আমার পারুতে কি ভাব! এমনটি কৈ, কোথাও তো দেখা যায় না!

দেবদাসের জননী বলিলেন, তা আর হবে না খুড়ী, দু'জনে ভাই-বোনের মতোই যে একসঙ্গে মানুষ হয়ে এসেচে।

হাঁ মা হাঁ—তাইত মনে হয়, যদি দু'জনের—এই দেখ না কেন বৌমা, দেবদাস যখন কলকাতায় গেল, বাছা তখন সবে আট বছরের; সেই বয়সেই ভেবে ভেবে যেন কাঠ হয়ে গেল। দেবদাসের একখানা চিঠি এলে, সেখানা যেন একবারে ওর জপমালা হয়ে উঠত। আমরা সবাই তো তা জানি!

দেবদাসের জননী মনে মনে সমস্ত বুঝিলেন। একটু হাসিলেন। এ হাসিতে বিদ্রূপ কতটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল জানি না, কিন্তু বেদনা অনেকখানি ছিল। তিনিও সব কথা জানিতেন, পার্বতীকে ভালও বাসিতেন। কিন্তু বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে যে! তার ওপর আবার ঘরের পাশে কুটুম্ব! ছি ছি! বলিলেন, খুড়ী, কর্তার তো একেবারে ইচ্ছা নয় এই ছেলেবেলায়, বিশেষ পড়াশুনার সময়ে দেবদাসের বিয়ে দেন। তাই তো কর্তা আমাকে এখনও বলেন, বড় ছেলে দ্বিজদাসের ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে কি সর্বনাশটাই করলে। লেখাপড়া একেবারেই হলো না।

পার্বতীর ঠাকুরমা একেবারে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তবুও কহিলেন, তা তো সব জানি বৌমা, কিন্তু কি জান—পারু, ষেটের বাছা একটু অমনি বেড়েচেও বটে, আর বাড়ন্ত গড়নও বটে, তাইতে—তাইতে—যদি নারাণের অমত—

দেবদাসের জননী বাধা দিলেন; বলিলেন, না খুড়ী, এ কথা আমি তাঁকে বলতে পারব না। দেবদাসের এ-সময়ে বিয়ের কথা পাড়লে, তিনি কি আমার মুখ দেখবেন!

কথাটা এইখানেই চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। দেবদাসের জননী কর্তার খাবার সময় কথাটা পাড়িয়া বলিলেন, পারুর ঠাকুমা আজ তার বিয়ের কথা পেড়েছিলেন।

কর্তা মুখ তুলিলেন; বলিলেন, হাঁ, পারুর বয়স হলো বটে; শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।

তাইতে তো আজ কথা পেড়েছিলেন। বললেন, দেবদাসের সঙ্গে যদি—

স্বামী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তুমি কি বললে?

আমি আর কি বলব! দু'জনের বড় ভাব; কিন্তু তাই বলে কি বেচা-কেনা, চক্রবর্তী-ঘরের মেয়ে আনতে পারি? তাতে আবার বাড়ির পাশে কুটুম্ব—ছি ছি!

কর্তা সন্তুষ্ট হইলেন; কহিলেন, ঠিক তাই। কুলের কি মুখ হাসাব? এ-সব কথায় কান দিও না।

গৃহিণী শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিলেন, না—আমি কান দিইনে; কিন্তু তুমিও যেন ভুলে যেয়ো না।

কর্তা গম্ভীরমুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়া বলিলেন, তা হলে এত বড় জমিদারি কোন্‌কালে উড়ে যেত!

জমিদারি তাঁহার চিরদিন থাকুক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু পার্বতীর দুঃখের কথাটা বলি। যখন এই প্রস্তাবটা নিতান্ত অগ্রাহ্য হইয়া নীলকণ্ঠের কানে গেল, তখন তিনি মাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, মা, কেন এমন কথা বলতে গিয়েছিলে?

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

নীলকণ্ঠ কহিতে লাগিলেন, মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হয় না, বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুৎসিত নয়। দেখো, তোমাদের বলে রাখলুম—এক হপ্তার মধ্যেই আমি সম্বন্ধ স্থির করে ফেলবো। বিয়ের ভাবনা কি?

কিন্তু যাহার জন্য পিতা এতবড় কথাটা বলিলেন, তাহার যে মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছোটবেলা হইতে তাহার একটা ধারণা ছিল যে, দেবদাদার উপর তাহার একটু অধিকার আছে। অধিকার কেহ যে হাতে তুলিয়া দিয়াছে, তাহা নয়। প্রথম সে নিজেও ঠিকমতো কিছুই বুঝিতে পারে নাই,—অজ্ঞাতসারে, অশান্ত মন দিনে দিনে এই অধিকারটি এমন নিঃশব্দে অথচ এতই দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল যে, বাহিরে যদিও একটা বাহ্য আকৃতি তাহার এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু, আজ এই হারানোর কথা উঠিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।

কিন্তু দেবদাসের সম্বন্ধে এই কথাটা ঠিক খাটানো যায় না। ছেলেবেলায় যখন সে পার্বতীর উপর দখল পাইয়াছিল, তখন তাহা সে পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় গিয়া কর্মের উৎসাহে ও অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদের

মধ্যে পার্বতীকে সে অনেকটা ছাড়িয়াই দিয়াছিল। কিন্তু সে জানিত না যে, পার্বতী তাহার সেই একঘেয়ে গ্রাম্য-জীবনের মধ্যে নিশিদিন শুধু তাহাকেই ধ্যান করিয়া আসিয়াছে। শুধু তাই নয়। সে ভাবিত, ছেলেবেলা হইতে যাহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়াই জানিয়াছিল, ন্যায়-অন্যায় সমস্ত আবদারই এতদিন যাহার উপর খাটাইয়া লইয়াছে, যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়াই তাহা হইতে এমন অকস্মাৎ পিছলাইয়া পড়িতে হইবে না। কিন্তু তখন কে ভাবিত বিবাহের কথা?কে জানিত সেই কিশোর-বন্ধন বিবাহ ব্যতীত কোনমতেই চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যায় না! 'বিবাহ হইতে পারে না', এই সংবাদটা পার্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু দেবদাসকে সকালবেলাটায় পড়াশুনা করিতে হয়; দুপুরবেলায় বড় গরম, ঘরের বাহির হওয়া যায় না, শুধু বিকেলবেলাটাতেই ইচ্ছা করিলে একটু বাহির হইতে পারা যায়।

এই সময়টাতেই কোনদিন বা সে জামাজোড়া পরিয়া ভাল জুতা পায়ে দিয়া ছড়ি হাতে ময়দানে বাহির হইত। যাইবার সময় চক্রবর্তীদের বাড়ির পাশ দিয়াই যাইত,—পার্বতী উপরে জানালা হইতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহা দেখিত। কত কথা মনে পড়িত। মনে পড়িত, দু'জনেই বড় হইয়াছে,—দীর্ঘ প্রবাসের পর পরের মতো এখন পরস্পরকে বড় লজ্জা করে। দেবদাস সেদিন অমনি চলিয়া গিয়াছিল; লজ্জা করিতেছিল, তাই ভাল করিয়া কথাই কহিতে পারে নাই। এটুকু পার্বতীর বুঝিতে বাকী ছিল না।

দেবদাসও প্রায় এমনি করিয়াই ভাবে। মাঝে মাঝে তাহার সহিত কথা কহিতে, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু অমনি মনে হয়, ইহা কি ভাল দেখাইবে?

এখানে কলিকাতার সেই কোলাহল নাই, আমোদ-আহ্লাদ, থিয়েটার, গান-বাজনা নাই—তাই কেবলই তাহার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই পার্বতী এই পার্বতী হইয়াছে! পার্বতী মনে করে, সেই দেবদাস—এখন এই দেবদাসবাবু হইয়াছে! দেবদাস এখন প্রায়ই চক্রবর্তীদের বাটীতে যায় না। কোনদিন যদি-বা সন্ধ্যার সময় উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকে, খুড়ীমা, কি হচ্ছে?

খুড়ীমা বলেন, এসো বাবা, বোস।

দেবদাস অমনি কহে—না থাক খুড়ীমা, একটু ঘুরে আসি।

তখন পার্বতী কোনদিন বা উপরে থাকে, কোনদিন বা সামনে পড়িয়া যায়। দেবদাস খুড়ীমার সহিত কথা কহে, পার্বতী ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। রাত্রে দেবদাসের ঘরে আলো জ্বলে। গ্রীষ্মকালের খোলা জানালা দিয়া পার্বতী সেদিকে বহুক্ষণ হয়ত চাহিয়া থাকে—আর কিছুই দেখা যায় না। পার্বতী চিরদিন অভিমানিনী। সে যে ক্লেশ সহ্য করিতেছে, ঘূণাগ্রে এ কথা কেহ না বুঝিতে পারে, পার্বতীর ইহা কায়মন চেষ্টা। আর জানাইয়াই বা লাভ কি?

সহানুভূতি সহ্য হইবে না, আর তিরস্কার-লাঞ্ছনা?—তা তার চেয়ে তো মরণ ভাল। মনোরমার গত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। এখনও সে শ্বশুরবাড়ি যায় নাই, তাই মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসে। পূর্বে দুই সখীতে মিলিয়া মাঝে মাঝে এইসব কথাবার্তা হইত, এখনও হয়; কিন্তু পার্বতী আর যোগ দেয় না—হয় চুপ করিয়া থাকে, না হয় কথা উলটাইয়া দেয়।

পার্বতীর পিতা কাল রাত্রে বাটী ফিরিয়াছেন। এ কয়দিন তিনি পাত্র স্থির করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। এখন বিবাহের সমস্ত স্থির করিয়া ঘরে আসিয়াছেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ দূরে বর্ধমান জেলায় হাতীপোতা গ্রামের জমিদারই পাত্র। তাঁহার অবস্থা ভাল, বয়স চল্লিশের নীচেই—গত বৎসর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, তাই আবার বিবাহ করিবেন। সংবাদটা যে বাটীর সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল, তাহা নহে, বরং দুঃখের কারণই হইয়াছিল; তবে একটা কথা এই যে, ভুবন চৌধুরীর নিকট হইতে সর্বরকমে প্রায় দু'তিন হাজার টাকা ঘরে আসিবে। তাই মেয়েরা চুপ করিয়া ছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা দেবদাস আহারে বসিয়াছিল। মা কাছে বসিয়া কহিলেন, পারুর যে বিয়ে।

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে?

এই মাসেই। কাল মেয়ে দেখে গেছে। বর নিজেই এসেছিল।

দেবদাস কিছু বিস্মিত হইল,—কৈ, আমি তো কিছু জানিনে মা!

তুমি আর কি করে জানবে? বর দোজবরে—বয়স হয়েচে; তবে বেশ টাকাকড়ি নাকি আছে, পারু সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।

দেবদাস মুখ নিচু করিয়া আহার করিতে লাগিল। তাহার জননী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, ওদের ইচ্ছা ছিল এই বাড়িতে বিয়ে দেয়।

দেবদাস মুখ তুলিল—তার পর?

জননী হাসিলেন—ছিঃ, তা কি হয়! একে বেচা-কেনা ছোটঘর, তাতে আবার ঘরের পাশে বিয়ে, ছি ছি—বলিয়া মা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন। দেবদাস তাহা দেখিতে পাইল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা পুনরায় কহিলেন, কর্তাকে আমি বলেছিলাম।

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কি বললেন?

কি আর বলবেন! এতবড় বংশের মুখ হাসাতে পারবেন না,—তাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

দেবদাস আর কথা কহিল না।

সেইদিন দ্বিপ্রহরে মনোরমা ও পার্বতীতে কথোপকথন হইতেছিল। পার্বতীর চোখে জল,—মনোরমা বোধ করি এইমাত্র মুছিয়াছে। মনোরমা কহিল,—তবে উপায় বোন?

পার্বতী চোখ মুছিয়া কহিল, উপায় আর কি? তোমার বরকে তুমি পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে?

আমার কথা আলাদা। আমার পছন্দ ছিল না, অপছন্দও হয়নি; তাই আমার কোন কষ্টই ভোগ করতে হয় না। কিন্তু তুমি যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেচ বোন!

পার্বতী জবাব দিল না,—ভাবিতে লাগিল।

মনোরমা কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, পারু, বরটির বয়স কত?

কার বরটির?

তোর।

পার্বতী একটু হিসাব করিয়া বলিল, বোধ হয় উনিশ।

মনোরমা অতিশয় বিস্মিত হইল; কহিল, সে কি, এই যে শুনলুম প্রায় চল্লিশ!

এবারে পার্বতীও একটু হাসিল; কহিল, মনোদিদি, কত লোকের বয়স চল্লিশ থাকে, আমি কি তার হিসাব রাখি? আমার বরের বয়স উনিশ-কুড়ি এই পর্যন্ত জানি।

মুখপানে চাহিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, কি নাম রে?

পার্বতী আবার হাসিয়া উঠিল—এতদিনে বুঝি তাও জানো না!

কি করে জানব!

জান না? আচ্ছা বলে দিই। একটু হাসিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া পার্বতী তাহার কানের

কাছে মুখ আনিয়া বলিল, জানিস নে—শ্রীদেবদাস—

মনোরমা প্রথমে একটু চমকাইয়া উঠিল। পরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আর ঠাট্টায় কাজ নেই। নাম কি, এই বেলা বল্, আর তো বলতে পাবিনে—

এই ত বললুম।

মনোরমা রাগ করিয়া কহিল, যদি দেবদাস নাম—তবে কান্নাকাটি করে মরচিস কেন?

পার্বতী সহসা মলিন হইয়া গেল। কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল, তা বটে। আর তো কান্নাকাটি করব না—

পারু।

কি?

সব কথা খুলে বল্‌না বোন! আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

পার্বতী কহিল, যা বলবার সবই তো বললুম।

কিন্তু কিছুই যে বোঝা গেল না রে!

যাবেও না। বলিয়া পার্বতী আর-একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মনোরমা ভাবিল, পার্বতী কথা লুকাইতেছে,—তাহার মনের কথা কহিবার ইচ্ছা নাই। বড় অভিমান হইল; দুঃখিত হইয়া কহিল, পারু, তোর যাতে দুঃখ, আমারও তো তাতে তাই বোন। তুই সুখী হ, এই তো আমার আন্তরিক প্রার্থনা। যদি কিছু তোর লুকোন কথা থাকে, আমাকে বলতে না চাস্, বলিস নে। কিন্তু এমন করে আমাকে তামাশা করিস নে।

পার্বতীও দুঃখিতা হইল, কহিল, ঠাট্টা করিনি দিদি। যতদূর নিজে জানি, ততদূর তোমাকেও বলেচি। আমি জানি, আমার স্বামীর নাম দেবদাস; বয়স উনিশ-কুড়ি—সেই কথাই তো তোমাকে বলেচি।

কিন্তু এই যে শুনলুম, তোর আর-কোথায় সম্বন্ধ স্থির হয়েচে!

স্থির আর কি! ঠাকুরমার সঙ্গে তো আর বিয়ে হবে না, হলে আমারই সঙ্গে হবে; আমি তো কৈ এ খবর শুনিনি!

মনোরমা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা এখন বলিতে গেল। পার্বতী তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, ও-সব শুনেচি।

তবে? দেবদাস তোকে—

কি আমাকে?

মনোরমা হাসি চাপিয়া বলিল, তবে স্বয়ম্বরা বুঝি? লুকিয়ে লুকিয়ে পাকা বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে?

কাঁচা-পাকা এখনও কিছুই হয়নি।

মনোরমা ব্যথিত-স্বরে কহিল, তুই কি বলিস পারু, কিছুই তো বুঝতে পারিনে।

পার্বতী কহিল, তা হলে দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করে তোমায় বুঝিয়ে দেব।

কি জিজ্ঞাসা করবে? সে বিয়ে করবে কি না, তাই?

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, তাই।

মনোরমা ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস কি পারু? তুই নিজে একথা জিজ্ঞাসা করবি?

দোষ কি দিদি?

মনোরমা একেবারে অবাক হইয়া গেল—বলিস কি রে? নিজে?

নিজেই। নইলে আমার হয়ে আর কে জিজ্ঞাসা করবে দিদি?

লজ্জা করবে না?

লজ্জা কি? তোমাকে বলতে লজ্জা করলুম?

আমি মেয়েমানুষ—তোর সই, কিন্তু সে যে পুরুষমানুষ পারু।

এবার পার্বতী হাসিয়া উঠিল; কহিল, তুমি সই, তুমি আপনার—কিন্তু তিনি কি পর? যে কথা তোমাকে বলতে পারি, সে কথা কি তাঁকে বলা যায় না?

মনোরমা অবাক হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পার্বতী হাসিমুখে কহিল, মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিঁদুর পরিস। কাকে স্বামী বলে তাই জানিস নে। তিনি আমার স্বামী না হলে, আমার সমস্ত লজ্জা-শরমের অতীত না হলে, আমি এমন করে মরতে বসতুম না। তা ছাড়া দিদি, মানুষ যখন মরতে বসে, তখন সে কি ভেবে দেখে, বিষটা তেতো কি মিষ্টি! তাঁর কাছে আমার কোন লজ্জা নেই।

মনোরমা মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, তাঁকে কি বলবি? বলবি যে পায়ে স্থান দাও?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই বলবো দিদি।

আর যদি সে স্থান না দেয়?

এবার পার্বতী বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, তখনকার কথা জানিনে দিদি।

বাটী ফিরিবার সময় মনোরমা ভাবিল, ধন্য সাহস! ধন্য বুকের পাটা! আমি যদি মরেও যাই তো এমন কথা মুখে আনতে পারিনে।

কথাটা সত্য। তাই তো পার্বতী বলিয়াছিল, ইহারা অনর্থক মাথায় সিন্দূর পরে, হাতে নোয়া দেয়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি বোধ হয় একটা বাজিয়া গিয়াছে। তখনও ম্লান জ্যোৎস্না আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। পার্বতী বিছানার চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কেহ জাগিয়া নাই। তাহার পর দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়াগ্রামের পথ, একেবারে স্তব্ধ, একেবারে নির্জন—কাহারও সাক্ষাতের আশঙ্কা ছিল না। সে বিনা বাধায় জমিদারবাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ির উপর বৃদ্ধ দরোয়ান কিষণ সিংহ খাটিয়া বিছাইয়া তখনও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছিল; পার্বতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ না তুলিয়াই কহিল, কে?

পার্বতী বলিল, আমি।

দ্বারবানজী কণ্ঠস্বরে বুঝিল স্ত্রীলোক। দাসী মনে করিয়া, সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতে লাগিল। পার্বতী চলিয়া গেল। গ্রীষ্মকাল; বাহিরে উঠানের উপর কয়েকজন ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ-বা নিদ্রিত, কেহ-বা অর্ধ-জাগরিত। তন্দ্রার ঘোরে কেহ-বা পার্বতীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু দাসী ভাবিয়া কথা কহিল না। পার্বতী নির্বিঘ্নে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। এ বাটীর প্রতি কক্ষ, প্রতি গবাক্ষ তাহার পরিচিত। দেবদাসের ঘর চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কপাট খোলা ছিল এবং ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। পার্বতী ভিতরে আসিয়া দেখিল, দেবদাস শয্যায় নিদ্রিত। শিয়রের কাছে কি একখানা বই তখনও খোলা পড়িয়াছিল—ভাবে বোধ হইল, সে এইমাত্র যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সে দেবদাসের পায়ের কাছে

আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল। দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা শুধু টক্‌টক্‌শব্দ করিতেছে, ইহা ভিন্ন সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত সুপ্ত।

পায়ের উপর হাত রাখিয়া পার্বতী ধীরে ধীরে ডাকিল, দেবদা!—

দেবদাস ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন ডাকিতেছে। চোখ না চাহিয়া সাড়া দিল, উঁ—

ও দেবদা—

এবার দেবদাস চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। পার্বতীর মুখে আবরণ নাই, ঘরে দীপও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে; সহজেই দেবদাস চিনিতে পারিল। কিন্তু প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। তাহার পর কহিল, এ কি! পারু নাকি?

হাঁ, আমি।

দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় বাড়িল—কহিল, এত রাত্রে?

পার্বতী উত্তর দিল না, মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কি একলা এসেচ নাকি?

পার্বতী বলিল, হাঁ।

দেবদাস উদ্বেগে, আশঙ্কায় কন্টকিত হইয়া কহিল, বল কি! পথে ভয় করেনি?

পার্বতী মৃদু হাসিয়া কহিল, ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

ভূতের ভয় না করুক, কিন্তু মানুষের ভয় তো করে! কেন এসেচ?

পার্বতী জবাব দিল না, কিন্তু মনে মনে কহিল, এ সময়ে আমার তাও বুঝি নেই।

বাড়ি ঢুকলে কি করে? কেউ দেখেনি তো?

দরোয়ান দেখেচে।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দরোয়ান দেখেচে? আর কেউ?

উঠানে চাকরেরা শুয়ে আছে—তাদের মধ্যেও বোধ হয় কেউ দেখে থাকবে।

দেবদাস বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কেউ চিনতে পেরেচে কি? পার্বতী কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, তারা সবাই আমাকে জানে, হয়ত-বা কেউ চিনে থাকবে।

বল কি? এমন কাজ কেন করলে পারু?

পার্বতী মনে মনে কহিল, তা তুমি কেমন করে বুঝবে? কিন্তু কোন কথা কহিল না,—অধোবদনে বসিয়া রহিল।

এত রাত্রে! ছি ছি! কাল মুখ দেখাবে কেমন করে?

মুখ নিচু করিয়াই পার্বতী বলিল, আমার সে সাহস আছে।

কথা শুনিয়া দেবদাস রাগ করিল না, কিন্তু নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, ছি ছি—এখনও কি তুমি ছেলেমানুষ আছ?এখানে, এভাবে আসতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হল না?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না।

কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না?

প্রশ্ন শুনিয়া পার্বতী তীব্র অথচ করুণ দৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া অসঙ্কোচে কহিল, মাথা কাটাই যেতো—যদি না আমি নিশ্চয় জানতুম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।

দেবদাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আমি! কিন্তু আমিই কি মুখ দেখাতে পারব?

পার্বতী তেমনি অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিল, তুমি? কিন্তু তোমার কি দেবদা?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, তুমি পুরুষমানুষ। আজ না হয় কাল তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলবে; দু'দিন পরে কেউ মনে রাখবে না—কবে কোন্‌রাত্রে হতভাগিনী পার্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে সমস্ত তুচ্ছ করে এসেছিল।

ও কি পারু?

আর আমি—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেবদাস কহিল, আর তুমি?

আমার কলঙ্কের কথা বলচ? না, আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম বলে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না।

ও কি পারু? কাঁদচ?

দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?

সহসা দেবদাস পার্বতীর হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিল—পার্বতী!

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদা!

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দেবদাসের পা বহিয়া অনেক ফোঁটা অশ্রু

শুভ্র শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে দেবদাস পার্বতীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?

পার্বতী কথা কহিল না। তেমনি করিয়া পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পড়িয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শুধু তাহার অশ্রুব্যাকুল ঘন দীর্ঘশ্বাস দুলিয়া দুলিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। টং টং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল। দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কি?

বাপ-মায়ের একেবারে অমত, তা শুনেচ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া জবাব দিল যে, সে শুনিয়াছে। তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দেবদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে আর কেন?

জলে ডুবিয়া মানুষ যেমন করিয়া অন্ধভাবে মাটি চাপিয়া ধরে, সেটা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, ঠিক তেমনি করিয়া পার্বতী অজ্ঞানের মতো দেবদাসের পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। মুখপানে চাহিয়া কহিল, আমি কিছুই জানতে চাইনে, দেবদা!

পারু, বাপ-মায়ের অবাধ্য হব?

দোষ কি? হও।

তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?

পার্বতী কাঁদিয়া বলিল, তোমার পায়ে—

আবার দুইজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। গ্রীষ্মকালের রাত্রি, আর অল্পক্ষণেই প্রভাত হইবে দেখিয়া দেবদাস পার্বতীর হাত ধরিয়া কহিল, চল, তোমাকে বাড়ি রেখে আসি—

আমার সঙ্গে যাবে?

ক্ষতি কি? যদি দুর্নাম রটে, হয়ত কতকটা উপায় হতে পারবে—

তবে চল।

উভয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন পিতার সহিত দেবদাসের অল্পক্ষণের জন্য কথাবার্তা হইল।

পিতা কহিলেন, তুমি চিরদিন আমাকে জ্বালাতন করিয়াছ, যতদিন বাঁচিব, ততদিনই জ্বালাতন হইতে হইবে। তোমার মুখে এ-কথায় আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

দেবদাস নিঃশব্দে অধোবদনে বসিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, আমি ইহার ভিতর নাই। যা ইচ্ছা হয়, তুমি ও তোমার জননীতে মিলিয়া কর।

দেবদাসের জননী এ-কথা শুনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—বাবা, এতও আমার অদৃষ্টে ছিল!

সেইদিন দেবদাস তোড়জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

পার্বতী এ-কথা শুনিয়া কঠোর মুখে আরও কঠিন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। গত রাত্রের কথা কেহই জানে না, সেও কাহাকে কহিল না। তবে মনোরমা আসিয়া ধরিয়া বসিল, পারু, শুনলাম দেবদাস চলে গেছে?

হাঁ—

তবে, তোর উপায় কি করেচে?

উপায়ের কথা সে নিজেই জানে না, অপরকে কি বলিবে? আজ কয়দিন হইতে সে নিরন্তর ইহাই ভাবিতেছিল; কিন্তু কোনোক্রমেই স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, তাহার আশা কতখানি এবং নিরাশা কতখানি। তবে একটা কথা এই যে, মানুষ এমনি দুঃসময়ের মাঝে আশা-নিরাশার কূলকিনারা যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্বল মন বড় ভয়ে ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া ধরিয়া থাকে। যেটা হইলে তাহার মঙ্গল, সেইটাই আশা করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই দিক পানেই নিতান্ত উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতে চাহে। পার্বতীর এই অবস্থায় সে কতকটা জোর করিয়া আশা করিতেছিল যে, কাল রাত্রের কথাটা নিশ্চয়ই বিফল হইবে না। বিফল হইলে তাহার দশা কি হইবে, এটা তাহার চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। তাই সে ভাবিতেছিল, দেবদাদা আবার আসিবে, আবার আমাকে ডাকিয়া বলিবে, পারু, তোমাকে আমি সাধ্য থাকিতে পরের হাতে দিতে পারিব না।

কিন্তু দিন-দুই পরে পার্বতী এইরূপ পত্র পাইল—

পার্বতী, আজ দুইদিন হইতে তোমার কথাই ভাবিয়াছি। পিতামাতার কাহারও ইচ্ছা নহে যে, আমাদের বিবাহ হয়। তোমাকে সুখী করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এত বড় আঘাত দিতে হইবে, যাহা আমার দ্বারা অসাধ্য। তা ছাড়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ কাজ করিবই বা কেমন করিয়া? তোমাকে আর যে কখন পত্র লিখিব, আপাতত এমন কথা ভাবিতে পারিতেছি না। তাই এ পত্রেই সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি। তোমাদের ঘর নীচু।

বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে মা কোনো মতেই ঘরে আনিবেন না; এবং ঘরের পাশে কুটুম্ব, ইহাই তাঁহার মতে নিতান্ত কদর্য। বাবার কথা—সে তো তুমি সমস্তই জান। সে রাত্রের কথা মনে করিয়া বড় ক্লেশ পাইতেছি। কারণ, তোমার মতো অভিমানিনী মেয়ে কত বড় ব্যথায় যে সে-কাজ পারিয়াছিল, সে আমি জানি।

আর এক কথা—তোমাকে আমি যে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনদিন মনে হয় নাই—আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না। শুধু এই আমার বড় দুঃখ যে, তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে। চেষ্টা করিয়া আমাকে ভুলিও, এবং আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি সফল হও।

—দেবদাস।

পত্রখানা যতক্ষণ দেবদাস ডাকঘরে নিক্ষেপ করে নাই, ততক্ষণ এক কথা ভাবিয়াছিল; কিন্তু রওনা করিবার পরমুহূর্ত হইতেই অন্য কথা ভাবিতে লাগিল। হাতের ঢিল ছুঁড়িয়া দিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। একটা অনির্দিষ্ট শঙ্কা তাহার মনের মাঝে ক্রমে ক্রমে জড় হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এ ঢিলটা তাহার মাথায় কিভাবে পড়িবে। খুব লাগিবে কি? বাঁচিবে তো? সে-রাত্রে পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সে কেমন করিয়া কাঁদিয়াছিল, পোস্ট অফিস হইতে বাসায় ফিরিবার পথে প্রতি পদক্ষেপে দেবদাসের ইহাই মনে পড়িতেছিল। কাজটা ভাল হইল কি? এবং সকলের উপরে দেবদাস এই ভাবিতেছিল যে, পার্বতীর নিজের যখন কোন দোষ নাই, তখন কেন পিতামাতা নিষেধ করেন? বয়সের বৃদ্ধির সহিত, এবং কলিকাতায় থাকিয়া, সে এই কথাটি বুঝিতে পারিতেছিল যে শুধু লোক-

দেখানো কুলমর্যাদা এবং একটা হীন খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া নিরর্থক একটা প্রাণনাশ করিতে নাই। যদি পার্বতী না বাঁচিতে চাহে, যদি সে নদীর জলে অন্তরের জ্বালা জুড়াইতে ছুটিয়া যায়, তা হইলে বিশ্বপতির চরণে কি একটা মহাপাতকের দাগ পড়িবে না?

বাসায় আসিয়া দেবদাস আপনার ঘরে শুইয়া পড়িল। আজকাল সে একটা মেসে থাকে। মাতুলের আশ্রয় সে অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে,—সেখানে তাহার কিছুতেই সুবিধা হইত না। যে ঘরে দেবদাস থাকে, তাহারই পাশের ঘরে চুনিলাল বলিয়া একজন যুবক আজ নয় বৎসর হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই দীর্ঘ কলিকাতা বাস বি. এ. পাশ করিবার জন্য অতিবাহিত হইয়াছে—আজিও সফলকাম হইতে পারেন নাই বলিয়া এখনো এইখানেই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে। চুনিলাল তাঁহার নিত্যকর্ম সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, ভোর নাগাত বাটী ফিরিবেন। বাসায় আর কেহ এখনও আসেন নাই। ঝি আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল, দেবদাস দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার পর একে একে সকলে ফিরিয়া আসিল। খাইবার সময় দেবদাসকে ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে উঠিল না। চুনিলাল কোনদিন রাত্রে বাসায় আসে না, আজিও আসে নাই।

তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাসায় দেবদাস ব্যতীত কেহই জাগিয়া নাই। চুনিলাল গৃহপ্রত্যাবর্তন করিয়া দেবদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ কিন্তু আলো জ্বলিতেছে; ডাকিল, দেবদাস কি জেগে আছ নাকি হে?

দেবদাস ভিতর হইতে কহিল, আছি, তুমি এর মধ্যে ফিরলে যে?

চুনিলাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, হাঁ, শরীরটা আজ ভাল নেই, বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দেবদাস, একবার দ্বার খুলতে পার?

পারি, কেন?

তামাকের জোগাড় আছে?

আছে। বলিয়া দেবদাস দ্বার খুলিয়া দিল। চুনিলাল তামাক সাজিতে বসিয়া কহিল, দেবদাস, এখনো জেগে কেন?

রোজ রোজই কি ঘুম হয়?

হয় না?

চুনিলাল যেন একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আমি ভাবতুম তোমাদের মতো ভাল ছেলেরা কখনো দুপুর রাত্রের মুখ দেখেনি—আমার আজ একটা নূতন শিক্ষা হল।

দেবদাস কথা কহিল না। চুনিলাল আপনার মনে তামাক খাইতে খাইতে কহিল, দেবদাস, বাড়ি থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত যেন ভাল নেই। তোমার মনে যেন কি ক্লেশ আছে।

দেবদাস অন্যমনস্ক হইয়াছিল। জবাব দিল না।

মনটা ভাল নেই, না হে?

দেবদাস হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ব্যগ্রভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা চুনিবাবু, তোমার মনে কি কোন ক্লেশ নেই?

চুনিলাল হাসিয়া উঠিল—কিছু না।

কখনও এ জীবনে ক্লেশ পাওনি?

এ কথা কেন?

আমার শুনতে বড় সাধ হয়।

তা হলে আর একদিন শুনো।

দেবদাস বলিল, আচ্ছা চুনি, তুমি সারারাত্রি কোথায় থাক?

চুনিলাল মৃদু হাসিয়া কহিল, তা কি তুমি জানো না?

জানি, কিন্তু ঠিক জানিনে।

চুনিলালের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এসব আলোচনার মধ্যে আর কিছু না থাক, একটা চক্ষুলজ্জাও যে আছে, দীর্ঘ অভ্যাসের দোষে সে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিল। কৌতুক করিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিল, দেবদাস, ভাল করে জানতে হলে কিন্তু ঠিক আমার মতো হওয়া চাই। কাল আমার সঙ্গে যাবে?

দেবদাস একবার ভাবিয়া দেখিল। তাহার পর কহিল, শুনি, সেখানে নাকি খুব আমোদ পাওয়া যায়। কোনো কষ্ট মনে থাকে না; এ কি সত্যি?

একেবারে খাঁটি সত্যি।

তা যদি হয়, তো আমাকে নিয়ে যেয়ো—আমি যাবো।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে চুনিলাল দেবদাসের ঘরে আসিয়া দেখিল, সে ব্যস্তভাবে জিনিসপত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া লইতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হে, যাবে না?

দেবদাস কোনদিকে না চাহিয়া কহিল, হাঁ, যাবো বৈ কি।

তবে এসব কি করচ?

যাবার উদ্যোগ করচি।

চুনিলাল ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, মন্দ উদ্যোগ নয়; কহিল, ঘর-বাড়ি কি সব সেখানে নিয়ে যাবে নাকি হে?

তবে কার কাছে রেখে যাব?

চুনিলাল বুঝিতে পারিল না। কহিল, জিনিসপত্র আমি কার কাছে রেখে যাই? সব তো বাসায় পড়ে থাকে।

দেবদাস যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া চোখ তুলিল। লজ্জিত হইয়া কহিল, চুনিবাবু আজ আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সে কি হে? কবে আসবে?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি আর আসব না।

বিস্ময়ে চুনিলাল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেবদাস কহিতে লাগিল,—এই টাকা নাও; আমার যা কিছু ধার আছে, এই থেকে শোধ করে দিয়ো। যদি কিছু বাঁচে, বাসার দাসী-চাকরকে বিলিয়ে দিয়ো। আমি আর কখনো কলকাতায় ফিরব না।

মনে মনে বলিতে লাগিল, কলকাতায় এসে আমার অনেক গেছে, অনেক গেছে।

আজ যৌবনের কুয়াশাচ্ছন্ন আঁধার ভেদ করিয়া তাহার চোখে পড়িতেছে—সেই দুর্দান্ত দুর্বিনীত কিশোর বয়সের সেই অযাচিত পদদলিত রত্ন আজ সমস্ত কলিকাতার তুলনাতেও যেন অনেক বড়, অনেক দামী। চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া বলিল, চুনি, শিক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান উন্নতি—যা কিছু, সব সুখের জন্য। যেমন করেই

দেখ না কেন, নিজের সুখ বাড়ানো ছাড়া এসকল আর কিছুই নয়—

চুনিলাল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, তবে তুমি কি আর লেখাপড়া করবে না নাকি?

না। লেখাপড়ার জন্যে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আগে যদি জানতাম, এতখানির বদলে আমার এইটুকু লেখাপড়া হবে, তাহলে আমি জন্মে কখনো কলিকাতার মুখ দেখতাম না।

তোমার হয়েছে কি?

দেবদাস ভাবিতে বসিল; কিছুক্ষণ পরে কহিল, আবার যদি কখন দেখা হয়, সব কথা বলব।

রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। বাসায় সকলে এবং চুনিলাল নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, দেবদাস গাড়িতে সমস্ত দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া চিরদিনের মতো বাসা পরিত্যাগ করিয়া বাটী চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে চুনিলাল রাগ করিয়া বাসার অপর সকলকে বলিতে লাগিল—এই রকম ভিজে-বেড়ালগোছ লোকগুলোকে আদতে চিনেতে পারা যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সতর্ক এবং অভিজ্ঞ লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা চক্ষুর নিমিষে কোন দ্রব্যের দোষগুণ সম্বন্ধে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করে না—সবটুকুর বিচার না করিয়া, সবটুকুর ধারণা করিয়া লয় না; দুটো দিক দেখিয়া চারিদিকের কথা কহে না। কিন্তু আর একরকমের লোক আছে, যাহারা ঠিক ইহার উলটা। কোন জিনিস বেশীক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার ধৈর্য ইহাদের নাই, কোন-কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে—ইহা ভাল কিংবা মন্দ; তলাইয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া লয়। এ-সকল লোক যে জগতে কাজ করিতে পারে না তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময় বেশী কাজ করে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ইহাদিগকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে দেখিতে পাওয়া যায়। আর না হইলে অবনতির গভীর কন্দরে চিরদিনের জন্য শুইয়া পড়ে; আর উঠিতে পারে না, আর বসিতে পারে না, আর আলোকের পানে চাহিয়া দেখে না; নিশ্চল, মৃত জড়পিণ্ডের মতো পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ দেবদাস।

পরদিন প্রাতঃকালে সে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, দেবা, কলেজের কি আবার ছুটি হল?

দেবদাস 'হাঁ' বলিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় চলিয়া গেল। পিতার প্রশ্নেও সে এমনি কি-একটা জবাব দিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল। তিনি ভাল বুঝিতে না পারিয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া কহিলেন, গরম এখনো কমেনি বলে আবার ছুটি হয়েচে।

দিন-দুই দেবদাস ছটফট করিয়া বেড়াইল। কেননা, যাহা কামনা তাহা হইতেছে না—পার্বতীর সহিত নির্জনে মোটেই সাক্ষাৎ হইল না। দিন-দুই পরে পার্বতীর জননী দেবদাসকে সুমুখে পাইয়া বলিলেন, যদি এসেচিস বাছা, তো পারুর বিয়ে পর্যন্ত থেকে যা।

দেবদাস কহিল, আচ্ছা।

দুপুরবেলা আহারাদি শেষ হইবার পর পার্বতী নিত্য বাঁধে জল আনিতে যাইত। কক্ষে পিত্তল-কলসী লইয়া আজিও সে ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিতে পাইল, অদূরে একটা কুলগাছের আড়ালে দেবদাস জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। একবার তাহার মনে হইল, ফিরিয়া যায়; একবার মনে হইল, নিঃশব্দে জল লইয়া প্রস্থান করে; কিন্তু তাড়াতাড়ি কোন কাজটাই সে করিতে পারিল না। কলসীটা ঘাটের উপর রাখিতে গিয়া বোধ হয় একটু শব্দ হওয়ায় দেবদাস চাহিয়া দেখিল। তাহার পর হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পারু, শুনে যাও।

পার্বতী ধীরে ধীরে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেবদাস একটিবার মাত্র মুখ তুলিল, তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে জলের পানে চাহিয়া রহিল।

পার্বতী কহিল, দেবদা, আমাকে কিছু বলবে?

দেবদাস কোনদিকে না চাহিয়া কহিল, হুঁ,—বোসো। পার্বতী বসিল না, আনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর্যন্ত যখন কোন কথাই হইল না, তখন পার্বতী এক-পা এক-পা করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে ফিরিয়া চলিতে লাগিল। দেবদাস একবার মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার পর পুনরায় জলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া

কহিল, শোন।

পার্বতী ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তথাপি দেবদাস আর কোন কথা কহিতে পারিল না দেখিয়া সে আবার ফিরিয়া গেল। দেবদাস নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সে ফিরিয়া দেখিল, পার্বতী জল লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে। তখন সে ছিপ গুটাইয়া ঘাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল আমি এসেচি।

পার্বতী ঘড়াটা শুধু নামাইয়া রাখিল, কথা কহিল না।

আমি এসেচি পারু!

পার্বতী কিছুক্ষণ কথা না কহিয়া, শেষে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তুমি আসতে লিখেছিলে, মনে নেই?

না।

সে কি পারু! সে রাত্রের কথা মনে পড়ে না?

তা পড়ে। কিন্তু সে কথার আর কাজ কি?

তাহার কণ্ঠস্বর স্থির, কিন্তু অতি রুক্ষ। কিন্তু দেবদাস তাহার মর্ম বুঝিল না; কহিল, আমাকে মাপ কর, পারু।আমি তখন অত বুঝিনি।

চুপ কর। ওসব কথা আমার শুনতেও ভাল লাগে না।

আমি যেমন করিয়া পারি, মা-বাপের মত করিব। শুধু তুমি—

পার্বতী দেবদাসের মুখপানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মা-বাপ আছেন, আমার নেই? তাঁদের মতামতের প্রয়োজন নেই?

দেবদাস লজ্জিত হইয়া কহিল, তা আছে বৈ কি পারু, কিন্তু তাঁদের তো অমত নেই,—তুমি শুধু—

কি করে জানলে তাঁদের অমত নেই? সম্পূর্ণ অমত।

দেবদাস হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিল—না গো, তাঁদের একটুকুও অমত নেই—সে আমি বেশ জানি। শুধু তুমি—

৪৪

পার্বতী কথার মাঝখানেই তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, শুধু আমি! তোমার সঙ্গে? ছিঃ—

চক্ষের পলকে দেবদাসের দুই চক্ষু আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল। কঠিনকণ্ঠে কহিল, পার্বতী! আমাকে কি ভুলে গেলে?

প্রথমটা পার্বতী থতমত খাইল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া শান্ত কঠিনস্বরে জবাব দিল, না, ভুলব কেন? ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসচি,

জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত ভয় করে আসচি—তুমি কি তাই আমাকে ভয় দেখাতে এসেচ? কিন্তু আমাকেই কি তুমি চেন না? বলিয়া সে নির্ভীক দুই চক্ষু তুলিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে দেবদাসের বাক্য-নিঃসরণ হইল না; পরে কহিল, চিরকাল ভয় করেই আমাকে এসেচ,—আর কিছু না?

পার্বতী দৃঢ়স্বরে বলিল, না, আর কিছুই না।

সত্যি বলচ?

হাঁ, সত্যিই বলচি। তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নেই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান্‌বুদ্ধিমান্—শান্ত এবং স্থির। তিনি ধার্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মতো একজন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতেই দেবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

একবার দেবদাস একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, একবার যেন একটু পথ ছাড়িতেও উদ্যত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়পদে মুখ তুলিয়া কহিল—এত অহঙ্কার!

পার্বতী বলিল, নয় কেন? তুমি পার, আমি পারিনে? তোমার রূপ আছে, গুণ নেই—আমার রূপ আছে, গুণও আছে। তোমরা বড়লোক, কিন্তু আমার বাবাও ভিক্ষে করে বেড়ান না। তা ছাড়া, দু'দিন পরে আমি নিজেও তোমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন থাকব না, সে তুমি জানো?

দেবদাস অবাক হইয়া গেল।

পার্বতী পুনরায় কহিয়া উঠিল—তুমি ভাবচ যে, আমার অনেক ক্ষতি করবে। অনেক না হোক, কিছু ক্ষতি করতে পার বটে, সে আমি জানি। বেশ, তাই করো। আমাকে শুধু পথ ছেড়ে দাও।

দেবদাস হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ক্ষতি কেমন করে করবো?

পার্বতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল—অপবাদ দিয়ে। তাই দাও গে যাও।

কথা শুনিয়া দেবদাস বজ্রাহতের মতো চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—অপবাদ দেব আমি!

পার্বতী বিষের মতো একটুখানি ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, যাও, শেষ সময়ে আমার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়ে দাও গে; সে রাত্রে তোমার কাছে একাকী গিয়েছিলাম, এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র করে দাও গে। মনের মধ্যে অনেকখানি সান্ত্বনা পেতে পারবে! বলিয়া পার্বতীর দর্পিত ক্রুদ্ধ ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

কিন্তু দেবদাসের বুকের ভিতরটায় রাগে অপমানে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। সে অব্যক্তস্বরে কহিল, মিথ্যে দুর্নাম রটিয়ে মনের মধ্যে সান্ত্বনা পাব আমি? এবং পরক্ষণেই সে ছিপের মোটা বাঁটটা সজোরে ঘুরাইয়া ধরিয়া ভীষণকণ্ঠে কহিল, শোন পার্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়। বলিয়া গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, দেখতে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভ্রমর বসে থাকে। এস,

তোমারও মুখে কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।

দেবদাসের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে দৃঢ়মুষ্টিতে ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া লইয়া সজোরে পার্বতীর মাথায় আঘাত করিল; সঙ্গে সঙ্গেই কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচে পর্যন্ত চিরিয়া গেল। চক্ষের নিমেষে সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল।

পার্বতী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, দেবদা, করলে কি!

দেবদাস ছিপটা টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে দিতে স্থিরভাবে উত্তর দিল, বেশী কিছু নয়, সামান্য খানিকটা কেটে গেছে মাত্র।

পার্বতী আকুল-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—ও গো, দেবদা!

দেবদাস নিজের পাতলা জামার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, জলে ভিজাইয়া পার্বতীর কপালের উপর বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, ভয় কি পারু! এ আঘাত শীঘ্র সেরে যাবে—শুধু দাগ থাকবে। যদি কেউ কখনো এ কথা জিজ্ঞাসা করে, মিথ্যা কথা বলো; না হয়, সত্য বলে নিজের কলঙ্ক নিজেই প্রকাশ করো।

ও গো, মা গো!—

ছিঃ অমন করে না পারু। শেষ-বিদায়ের দিনে শুধু একটুখানি মনে রাখবার মতো চিহ্ন রেখে গেলাম। অমন সোনার মুখ আরশিতে মাঝে মাঝে দেখবে তো? বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিতে উদ্যত হইল।

পার্বতী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, দেবদাদা গো—

দেবদাস ফিরিয়া আসিল। চোখের কোণে একফোঁটা জল।

বড় স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল, কেন রে পারু?

কাউকে যেন বলো না।

দেবদাস নিমিষে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পার্বতীর চুলের উপর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, ছিঃ—তুই কি আমার পর পারু? তোর মনে নেই, দুষ্টামি করলে ছেলেবেলায় কত তোর কান মলে দিয়েচি।

দেবদাদা—মাপ কর আমাকে।

তা তোকে বলতে হবে না ভাই। সত্যিই কি পারু, আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস? কবে তোর ওপর রাগ করেছিলাম? কবে মাপ করিনি?

দেবদাদা—

পার্বতী, তুমি তো জানো, আমি বেশী কথা বলতে পারিনে; বেশী ভেবেচিন্তে কাজ করতেও পারিনে। যখন যা মনে হয় করি। বলিয়া দেবদাস পার্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল, তুমি ভালই করেছ। আমার কাছে তুমি তো সুখ পেতে না; কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটত।

এই সময় বাঁধের অন্যদিকে কাহারা আসিতেছিল। পার্বতী ধীরে ধীরে জলে আসিয়া নামিল। দেবদাস চলিয়া গেল। পার্বতী যখন বাটী ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুমা না দেখিয়াই কহিতেছিলেন, পারু, পুকুর খুঁড়ে কি জল আনচিস দিদি!

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পার্বতীর মুখপানে চাহিবামাত্রই চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ও মা গো! এ সর্বনাশ কেমন করে হল?

ক্ষতস্থান দিয়া তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল; বস্ত্রখণ্ড প্রায় সমস্তটাই রক্তে রাঙ্গা। কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো মা গো! তোর যে বিয়ে পারু!

পার্বতী স্থিরভাবে কলসী নামাইয়া রাখিল। মা আসিয়া কাঁদিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ সর্বনাশ কি করে হলো, পারু!

পারু সহজভাবে বলিল, ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম। ইঁটে মাথা লেগে কেটে গেছে।

তাহার পর সকলে মিলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেবদাস সত্য কথাই কহিয়াছিল,—আঘাত বেশী নয়। চার-পাঁচ দিনেই শুকাইয়া উঠিল। আরো আট-দশ দিন অমনি গেল। তাহার পর একদিন রাত্রে হাতীপোতা গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী বর সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। উৎসবে ঘটাপটা তেমন হইল না। ভুবনবাবু নির্বোধ লোক ছিলেন না,—প্রৌঢ় বয়সে আবার বিবাহ করিতে

আসিয়া ছোকরা সাজাটা ভাল বোধ করেন নাই।

বরের বয়স চল্লিশের নীচে নহে,—কিছু উপর; গৌরবর্ণ, মোটাসোটা নন্দদুলাল ধরনের শরীর! কাঁচাপাকা গোঁফ, মাথার সামনে একটু টাক।

বর দেখিয়া কেহ হাসিল, কেহ চুপ করিয়া রহিল। ভুবনবাবু শান্ত-গম্ভীরমুখে কতকটা যেন অপরাধীর মতো, ছাদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কানমলা প্রভৃতি অত্যাচার উপদ্রব হইল না; কারণ, অতখানি বিজ্ঞ গম্ভীর লোকের কানে কাহারই হাত উঠিল না। শুভদৃষ্টির সময় পার্বতী কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। ওষ্ঠের কোণে একটু হাসির রেখা,—ভুবনবাবু ছেলেমানুষটির মতো দৃষ্টি অবনত করিলেন। পাড়ার মেয়েরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চক্রবর্তী মহাশয় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রবীণ জামাতা লইয়া তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জমিদার নারাণ মুখুয্যে আজ কন্যাকর্তা। পাকা লোক—কোন পক্ষে, কোনদিকেই ত্রুটি হইল না। শুভকর্ম সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে চৌধুরীমহাশয় এক বাক্স অলঙ্কার বাহির করিয়া দিলেন। পার্বতীর সর্বাঙ্গে সে-সকল ঝলমল করিয়া উঠিল। জননী তাহা দেখিয়া আঁচল দিয়া চোখের কোণ মুছিলেন। নিকটে জমিদার-গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি সস্নেহে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আজ চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস নে দিদি!

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মনোরমা পার্বতীকে একটা নির্জন ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া আশীর্বাদ করিল—যা হল, ভালই হল। এখন থেকে দেখবি—কত সুখে থাকবি।

পার্বতী অল্প হাসিয়া বলিল, তা থাকব। যমের সঙ্গে কাল একটুখানি পরিচয় হয়েছে

কিনা!

ও কি কথা রে!

সময়ে সব দেখতে পাবি৷

মনোরমা তখন অন্য কথা পাড়িল; কহিল, একবার ইচ্ছে করে, দেবদাসকে ডেকে এনে এই সোনার প্রতিমা দেখাই!

পার্বতীর যেন চমক ভাঙ্গিল৷ পারিস দিদি? একবার ডেকে আনতে পারা যায় না?

কণ্ঠস্বরে মনোরমা শিহরিয়া উঠিল,—কেন পারু!

পার্বতী হাতের বালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্যমনস্কভাবে কহিল, একবার পায়ের ধূলা মাথায় নেব—আজ যাব কিনা!

মনোরমা পার্বতীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, দু'জনে বড় কান্না কাঁদিল৷ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘর অন্ধকার—পিতামহী দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইতে কহিলেন, ও পারু ও মনো, তোরা বাইরে আয় দিদি!

সেই রাত্রিতেই পার্বতী স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল৷

নবম পরিচ্ছেদ

আর দেবদাস? সে রাত্রিটা সে কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার খুব যে ক্লেশ হইতেছিল, যাতনায় মর্মভেদ হইতেছিল, তাহা নয়। কেমন একটা শিথিল ঔদাস্য ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে জমা হইয়া উঠিতেছিল। নিদ্রার মধ্যে শরীরের কোন একটা অঙ্গে হঠাৎ পক্ষাঘাত হইলে, ঘুম ভাঙ্গিয়া সেটার উপর যেমন কোন অধিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং বিস্মিত স্তম্ভিত মন মুহূর্তে ঠাওরাইতে পারে না, কেন তাহার আজন্ম-সঙ্গী চিরদিনের বিশ্বস্ত অঙ্গটা তাহার আহ্বানে সাড়া দিতেছে না; তাহার পর ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা যায়, ধীরে ধীরে জ্ঞান জন্মে যে, এটা আর তাহার নিজের নাই; দেবদাস এমনি ধীরে ধীরে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বুঝিতেছিল যে, সময়ে সংসারটার অকস্মাৎ পক্ষাঘাত হইয়া, তাহার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার উপর মিথ্যা রাগ-অভিমান আর কিছুই খাটিবে না। সাবেক অধিকারের কথাটা ভাবিতে যাওয়াই ভুল হইবে। তখন সূর্যোদয় হইতেছিল। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, কোথায় যাই? হঠাৎ স্মরণ হইল তাহার কলিকাতার বাসাটা। সেখানে চুনিলাল আছে। দেবদাস চলিতে লাগিল। পথে বার-দুই ধাক্কা খাইল, হোঁচট খাইয়া অঙ্গুলি রক্তাক্ত করিল—টাল খাইয়া একজনের গায়ের উপর পড়িতেছিল,—সে মাতাল বলিয়া ঠেলিয়া দিল। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনশেষে মেসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিবাবু তখন বেশবিন্যাস করিয়া বাহির হইতেছিলেন—এ কি, দেবদাস যে!

দেবদাস নীরবে চাহিয়া রহিল।

কখন এলে হে? মুখ শুকনো, স্নানাহার হয়নি—ওকি—কি! দেবদাস পথের

উপরেই বসিয়া পড়িতেছিল, চুনিলাল হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। নিজের শয্যার উপর বসাইয়া, শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি দেবদাস?

কাল বাড়ি থেকে এসেচি।

কাল? সমস্তদিন তবে ছিলে কোথায়? রাত্রেই বা কোথায় ছিলে?

ইডেন গার্ডেনে।

পাগল নাকি! কি হয়েছে, বল দেখি?

শুনে কি হবে?

না বল, এখন খাওয়া-দাওয়া করো। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

কিছুই আনিনি।

তা হোক, এখন খেতে বোস।

তখন জোর করিয়া চুনিলাল কিছু আহার করাইয়া, শয্যায় শুইতে আদেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, আমি রাত্রে এসে তোমাকে তুলব। বলিয়া সে তখনকার মতো চলিয়া গেল। রাত্রি দশটার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দেবদাস তাহার বিছানায় গভীর নিদ্রায় সুপ্ত। না ডাকিয়া, সে নিজে একখানা কম্বল টানিয়া লইয়া, নীচে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সারা

রাত্রির মধ্যে দেবদাসের ঘুম ভাঙ্গিল না, প্রভাতেও না, বেলা দশটার সময় সে উঠিয়া বসিয়া কহিল, চুনিবাবু, কখন এলে হে?

এইমাত্র আসচি।

তবে তোমার কোনোরকম অসুবিধা হয়নি!

কিছু না।

দেবদাস কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুনিবাবু, আমার যে কিছু নেই, তুমি আমাকে প্রতিপালন করবে?

চুনিলাল হাসিল। সে জানিত, দেবদাসের পিতা মহা ধনবান ব্যক্তি। তাই হাসিয়া কহিল, আমি প্রতিপালন করব! বেশ কথা। তোমার যতদিন ইচ্ছা থাক, কোন ভাবনা নেই।

চুনিবাবু, তোমার আয় কত?

ভাই, আমার আয় সামান্য। বাটীতে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তা দাদার কাছে গচ্ছিত রেখে এখানে বাস করি। তিনি প্রতিমাসে সত্তর টাকা হিসাবে পাঠিয়ে দেন। এতে তোমার আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

তুমি বাড়ি যাও না কেন?

চুনিলাল ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, সে অনেক কথা।

দেবদাস আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে আহারাদির জন্য ডাক পড়িল। তাহার পর দুইজনে স্নানাহার শেষ করিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিলে চুনিলাল বলিল, দেবদাস, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেচ?

না।

আর কারো সঙ্গে?

দেবদাস তেমনি জবাব দিল, না।

তাহার পর চুনিলালের হঠাৎ অন্য কথা স্মরণ হইল। কহিল, ওহো, তোমার এখনো বিয়েই হয়নি যে!

এই সময় দেবদাস অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণেই চুনিলাল দেখিল, দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আরও দুইদিন অতীত হইল। তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে দেবদাস সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। মুখ হইতে সেই ঘন ছায়া যেন অনেকটা সরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। চুনিলাল জিজ্ঞাসা করিল, আজ শরীর কেমন?

বোধ হয় অনেকটা ভাল। আচ্ছা চুনিবাবু, রাত্রে তুমি কোথায় যাও?

আজ চুনিলাল লজ্জিত হইল; বলিল, হাঁ, তা যাই বটে, কিন্তু সে কথা কেন?

আচ্ছা,—আর তুমি কেন কলেজে যাও না?

না—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েচি।

ছিঃ, তা কি হয়? মাস-দুই পরে তোমার পরীক্ষা। পড়াও তোমার মন্দ হয়নি, এবার কেন পরীক্ষা দাও না!

না—পড়া ছেড়ে দিয়েচি।

চুনিলাল চুপ করিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাও—বলবে না? তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

চুনিলাল দেবদাসের মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি জান দেবদাস, আমি খুব ভাল জায়গায় যাইনে।

দেবদাস যেন আপনার মনে কহিল, ভাল আর মন্দ! ছাই কথা!—চুনিবাবু, আমাকে সঙ্গে নেবে না?

তা নিতে পারি। কিন্তু তুমি যেয়ো না।

না, আমি যাবই। যদি ভাল না লাগে, আর না হয় যাব না। কিন্তু তুমি যে সুখের

আশায় প্রত্যহ উন্মুখ হয়ে থাকো—যাই হোক চুনিবাবু, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

চুনিলাল মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, আমার দশা! মুখে বলিল, আচ্ছা, তাই যেয়ো।

অপরাহ্নবেলায় ধর্মদাস জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। দেবদাসকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দেব্‌তা, আজ তিন-চারদিন ধরে মা কত যে কাঁদচেন—

কেন রে?

কিছু না বলে হঠাৎ চলে এলে কেন? একখানা পত্র বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, মার চিঠি।

চুনিলাল ভিতরের খবর বুঝিবার জন্য উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল। দেবদাস পত্র পাঠ করিয়া রাখিয়া দিল। জননী বাটী আসিবার জন্য আদেশ ও অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন।সমস্ত বাটীর মধ্যে তিনিই শুধু দেবদাসের অকস্মাৎ তিরোধানের কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মদাসের হাত দিয়া লুকাইয়া অনেকগুলি টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। ধর্মদাস সেগুলি হাতে দিয়া কহিল, দেব্‌তা, বাড়ি চল।

আমি যাব না। তুই ফিরে যা।

রাত্রিতে দুই বন্ধু বেশবিন্যাস করিয়া বাহির হইল। দেবদাসের এ-সকলে তেমন প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু চুনিলাল কিছুতেই সামান্য পোশাকে বাহির হইতে রাজী হইল

না। রাত্রি নয়টার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি চিৎপুরের একটি দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চুনিলাল দেবদাসের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামিনীর নাম চন্দ্রমুখী—সে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এইবার দেবদাসের সর্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। সে যে এই কয়দিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে নারীদেহের ছায়ার উপরেও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সে নিজেই জানিত না।

চন্দ্রমুখীকে দেখিবামাত্রই অন্তরের নিবিড় ঘৃণা দাবদাহের ন্যায় বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, চুনিবাবু, এ কোন হতভাগা জায়গায় আনলে? তার তীব্রকণ্ঠ ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া চন্দ্রমুখী ও চুনিলাল উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরক্ষণেই চুনিলাল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দেবদাসের একটা হাত ধরিয়া কোমল-কণ্ঠে কহিল, চল চল, ভিতরে গিয়ে বসি।

দেবদাস আর কিছু কহিল না—ঘরের ভিতরে আসিয়া নীচের বিছানায় বিষণ্ন নতমুখে উপবেশন করিল। চন্দ্রমুখীও নীরবে অদূরে বসিয়া পড়িল। ঝি রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল—দেবদাস স্পর্শও করিল না। চুনিলাল মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঝি কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে চন্দ্রমুখীর হাতেই হুঁকাটা দিয়া প্রস্থান করিল। সে দুই-একবার টানিবার সময়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, হঠাৎ নিরতিশয় ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, কি অসভ্য আর কি বিশ্রীই দেখতে!

ইতিপূর্বে চন্দ্রমুখীকে কেহ কখনো কথায় ঠকাইতে পারে নাই। তাহাকে অপ্রতিভ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু দেবদাসের এই আন্তরিক ঘৃণার সরল এবং কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। ক্ষণকালের জন্য সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে আরও বার-দুই গুড়গুড় করিয়া শব্দ হইল, কিন্তু চন্দ্রমুখীর মুখ দিয়া আর ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন চুনিলালের হাতে হুঁকা দিয়া সে একবার দেবদাসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নির্বাক তিনজনেই। শুধু গুড়গুড় করিয়া হুঁকার শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা যেন বড় ভয়ে ভয়ে। বন্ধুমণ্ডলীর মাঝে তর্ক উঠিয়া হঠাৎ নিরর্থক একটা কলহ হইয়া গেলে, প্রত্যেকেই যেমন নীরবে নিজের মনে ফুলিতে থাকে, এবং ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ মিছামিছি কহিতে থাকে, তাইত! এমনি তিনজনেই মনে মনে বলিতে লাগিল, তাইত! এ কেমন হইল!

যেমনই হোক, কেহই স্বস্তি পাইতেছিল না। চুনিলাল হুঁকা রাখিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল, বোধ করি আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইল না,—তাই। ঘরে দুইজন বসিয়া রহিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি টাকা নাও?

চন্দ্রমুখী সহসা উত্তর দিতে পারিল না। আজ তার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক সে একটি দিনও দেখে নাই। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আপনার যখন পায়ের ধুলো পড়েচে—

দেবদাস কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, পায়ের ধুলোর কথা নয়। টাকা নাও তো?

তা নিই বৈ কি। না হলে আমাদের চলবে কিসে?

থাক, অত শুনতে চাইনে। বলিয়া সে পকেটে হাত দিয়া একখানা নোট বাহির

করিল এবং চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়াই চলিতে উদ্যত হইল—একবার চাহিয়াও দেখিল না কত টাকা দিল।

চন্দ্রমুখী বিনীতভাবে কহিল, এরি মধ্যে যাবেন?

দেবদাস কথা কহিল না—বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমুখীর একবার ইচ্ছা হইল, টাকাটা ফিরাইয়া দেয়; কিন্তু কেমন একটা তীব্র সঙ্কোচের বশে পারিল না, বোধ করি বা একটু ভয়ও তাহার হইয়াছিল। তা ছাড়া অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করা অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেবদাস সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সিঁড়ির পথেই চুনিলালের সহিত দেখা হইল। সে আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্চ দেবদাস?

বাসায় যাচ্চি।

সে কি হে?

দেবদাস আরও দুই-তিনটি সিঁড়ি নামিয়া পড়িল।

চুনিলাল কহিল, চল, আমিও যাই।

দেবদাস কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চল।

একটু দাঁড়াও, একবার উপর থেকে আসি।

না, আমি যাই, তুমি পরে এসো; বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

চুনিলাল উপরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী তখনও সেইভাবে চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া কহিল, বন্ধু চলে গেল?

হ্যাঁ।

চন্দ্রমুখী হাতের নোট দেখাইয়া কহিল, এই দেখ। কিন্তু ভাল বোধ কর তো নিয়ে যাও; তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ো।

চুনিলাল কহিল, সে ইচ্ছে করে দিয়ে গেছে, আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কেন?

এতক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী একটুখানি হাসিতে পারিল; কিন্তু হাসিতে আনন্দ ছিল না। কহিল, ইচ্ছে করে নয়, আমরা টাকা নিই বলে রাগ করে দিয়ে গেছে। হাঁ, চুনিবাবু, লোকটা কি পাগল?

একটুও না। তবে আজ কদিন থেকে বোধ করি ওর মন ভালো নেই।

কেন মন ভালো নেই—কিছু জানো?

তা জানিনে। বোধ হয় বাড়িতে কিছু হয়ে থাকবে।

তবে এখানে আনলে কেন?

আমি আনতে চাইনি, সে নিজে জোর করে এসেছিল।

চন্দ্রমুখী এবার যথার্থই বিস্মিত হইল। কহিল, জোর করে নিজে এসেছিল? সমস্ত জেনে?

চুনিলাল একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তা বৈ কি! সমস্তই তো জানত। আমি তো আর ভুলিয়ে আনিনি।

চন্দ্রমুখী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া কহিল, চুনি, আমার একটি উপকার করবে?

কি?

তোমার বন্ধু কোথায় থাকেন?

আমার কাছে।

আর-একদিন তাকে আনতে পারবে?

তা বোধ হয় পারব না। এর আগেও কখনো সে এ-সব জায়গায় আসেনি, পরেও বোধ হয় আর আসবে না। কিন্তু কেন বল দেখি?

চন্দ্রমুখী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, চুনি, যেমন করে হোক, ভুলিয়ে আর একবার তাকে এনো।

চুনি হাসিল; চোখ টিপিয়া কহিল, ধমক খেয়ে ভালোবাসা জন্মাল নাকি?

চন্দ্রমুখীও হাসিল; কহিল, না দেখে নোট দিয়ে যায়—এটা বুঝলে না?

চুনি চন্দ্রমুখীকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—না, নোট - ফোটের লোক আলাদা— সে তুমি নও। কিন্তু সত্যি কথাটা কি বল তো?

চন্দ্রমুখী কহিল, সত্যিই একটু মায়া পড়েচে।

চুনি বিশ্বাস করিল না; হাসিয়া কহিল, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে?

এবার চন্দ্রমুখীও হাসিতে লাগিল। বলিল, তা হোক। মন ভালো হলে আর একদিন এনো—আর একবার দেখব। আনবে তো?

কি জানি!

আমার মাথার দিব্যি রইল।

আচ্ছা—দেখব।

দশম পরিচ্ছেদ

পার্বতী আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মস্ত বাড়ি। নূতন সাহেবী ফ্যাশনের নহে, পুরাতন সেকেলে ধরনের। সদর মহল, অন্দর মহল, পূজার দালান, নাটমন্দির, অতিথিশালা, কাছারি-বাড়ি, তোশাখানা, কত দাসদাসী—পার্বতী অবাক হইয়া গেল। সে শুনিয়াছিল তাহার স্বামী বড়লোক, জমিদার। কিন্তু এতটা ভাবে নাই। অভাব শুধু লোকের। আত্মীয়, কুটুম্ব-কুটুম্বিনী কেহই প্রায় নাই। অত বড় অন্দর মহল জনশূন্য। পার্বতী বিয়ের কনে, একেবারে গৃহিণী হইয়া বসিল। বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য একজন বৃদ্ধা পিসী ছিলেন। ইনি ভিন্ন কেবল দাসদাসীর দল।

সন্ধ্যার পূর্বে একজন সুশ্রী সুন্দর বিংশবর্ষীয় যুবাপুরুষ প্রণাম করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া কহিল, মা, আমি তোমার বড়ছেলে।

পার্বতী অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া ঈষৎ চাহিয়া দেখিল, কথা কহিল না। সে আর একবার প্রণাম করিয়া কহিল, মা আমি তোমার বড়ছেলে—প্রণাম করি।

পার্বতী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন কপালের উপর পর্যন্ত তুলিয়া দিয়া এবার কথা কহিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, এস বাবা, এস।

ছেলেটির নাম মহেন্দ্র। সে কিছুক্ষণ পার্বতীর মুখপানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; তৎপর অদূরে বসিয়া পড়িয়া বিনীতস্বরে বলিতে লাগিল, আজ দু'বছর হল আমরা মা হারিয়েচি। এই দু'বছর আমাদের দুঃখে-কষ্টেই দিন কেটেচে। আজ তুমি এলে,—আশীর্বাদ কর মা, এবার যেন সুখে থাকতে পাই।

পার্বতী বেশ সহজ গলায় কথা কহিল। কেননা, একেবারে গৃহিণী হইতে হইলে অনেক কথা জানিবার এবং বলিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ কাহিনী অনেকের কাছেই হয়ত একটু অস্বাভাবিক শুনাইবে। তবে যিনি পার্বতীকে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন তিনি দেখিতে পাইবেন, অবস্থার এই নানারূপ পরিবর্তনে পার্বতীকে তাহার বয়সের অপেক্ষা অনেকখানি পরিপক্ক করিয়া দিয়াছিল। তা ছাড়া নিরর্থক লজ্জা-শরম, অহেতুক জড়তা-সঙ্কোচ তাহার কোনদিনই ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর সব ছেলেমেয়েরা কোথায় বাবা?

মহেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, বলচি। তোমার বড়মেয়ে, আমার ছোটবোন তার শ্বশুরবাড়িতেই আছে। আমি চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু যশোদা কিছুতেই আসতে পারলে না।

পার্বতী দুঃখিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল আস্তে পারলে না, না ইচ্ছা করে এলো না?

মহেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, ঠিক জানিনে মা।

কিন্তু তাহার কথার ও মুখের ভাবে পার্বতী বুঝিল, যশোদা রাগ করিয়াই আইসে নাই; কহিল, আর আমার ছোটছেলে?

মহেন্দ্র কহিল, সে শিগগির আসবে। কলকাতায় আছে, পরীক্ষা দিয়েই আসবে।

ভুবন চৌধুরী নিজেই জমিদারির কাজকর্ম দেখিতেন। তা ছাড়া, স্বহস্তে নিত্য শালগ্রাম-শিলার পূজা করা, ব্রত-নিয়ম-উপবাস, ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালায় সাধু-

সন্ন্যাসীর পরিচর্যা—এইসব কাজে তাঁহার সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। নূতন বিবাহ করিয়া কোন প্রকার নূতন আমোদ-আহ্লাদ তাঁহাতে প্রকাশ পাইল না। রাত্রে কোনদিন ভিতরে আসিতেন, কোনদিন বা আসিতে পারিতেন না। আসিলেও অতি সামান্যই কথাবার্তা হইত—শয্যায় শুইয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া, চোখ বুজিয়া বড় জোর বলিতেন, তা তুমিই হলে বাড়ির গৃহিণী, সব দেখে-শুনে, বুঝেপড়ে নিজেই নিয়ো—

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিত,আচ্ছা।

ভুবন বলিতেন, আর দেখ, তা এই ছেলেমেয়েরা,—হাঁ তা এরা তোমারই তো সব—

স্বামীর লজ্জা দেখিয়া পার্বতীর চোখের কোণে হাসি ফুটিয়া বাহির হইত। তিনি আবার একটু হাসিয়া কহিতেন, হাঁ, আর এই দেখ, এই মহেন তোমার বড়ছেলে, সেদিন বি. এ. পাশ করেছে,—এমন ভাল ছেলে, এমন দয়ামায়া—কি জান, একটু যত্ন-আত্মীয়তা—

পার্বতী হাসি চাপিয়া বলিত, আমি জানি, সে আমার বড়ছেলে—

তা জানবে বৈ কি! এমন ছেলে কেউ কখনও দেখেনি। আর আমার যশোমতী, মেয়ে তো নয়— প্রতিমা। তা আসবে বৈ কি! আসবে বৈ কি! বুড়ো বাপকে দেখতে আসবে না! তা সে এলে তাকে—

পার্বতী নিকটে আসিয়া টাকের উপর মৃণালহস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিত, তোমাকে ভাবতে হবে না। যশোকে আনবার জন্য আমি লোক পাঠাব—না হয় মহেন নিজেই যাবে।

যাবে! যাবে! আহা, অনেকদিন দেখিনি—তুমি লোক পাঠাবে?

পাঠাব বৈ কি। আমার মেয়ে, আমি আনতে পাঠাব না!

বৃদ্ধ এই সময়ে উৎসাহে উঠিয়া বসিতেন। উভয়ের সম্বন্ধ ভুলিয়া পার্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিতেন—তোমার ভাল হবে। আমি আশীর্বাদ করচি—তুমি সুখী হবে—ভগবান তোমায় দীর্ঘায়ু করবেন।

তাহার পর হঠাৎ কি-সব কথা বৃদ্ধের যেন মনে পড়িয়া যাইত। পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া মনে মনে বলিতেন, বড়মেয়ে, ঐ এক মেয়ে,—সে বড় ভালবাসত—

এ সময়ে কাঁচা-পাকা গোঁফের পাশ দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িত। পার্বতী মুছাইয়া দিত। কখনো কখনো বা চুপি চুপি বলিতেন, আহা, তারা সবাই আসবে, আর-একবার বাড়ি-ঘরদোর জমজম করবে—আহা, আগে কি জমকালো সংসারই ছিল! ছেলেরা, মেয়ে, গিন্নী—হৈচৈ—নিত্য দুর্গোৎসব। তারপর একদিন সব নিবে গেল। ছেলেরা কলকাতায় চলে গেল, যশোকে তার শ্বশুর নিয়ে গেল। তারপর অন্ধকার শ্মশান—

এই সময় আবার গোঁফের দু'পাশ ভিজিয়া বালিশ ভিজিতে শুরু করিত। পার্বতী

কাতর হইয়া মুছাইয়া দিয়া কহিত, মহেনের কেন বিয়ে দিলে না?

বুড়ো বলিতেন, আহা, সে তো আমার সুখের দিন। তাইত ভেবেছিলাম কিন্তু কি যে ওর মনের কথা, কি যে ওর জিদ—কিছুতেই বিয়ে করলে না। তাইত বুড়ো বয়সে—বাড়ি ঘর খাঁখাঁ করে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়ির মতোই সমস্তই মলিন, একটা জলুস কিছুতেই দেখতে পাইনে—তাইতেই—

কথা শুনিয়া পার্বতীর দুঃখ হইত। করুণসুরে, হাসির ভান করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিত, তুমি বুড়ো হলে আমিও শিগগির বুড়ো হয়ে যাব। মেয়েমানুষের বুড়ো হতে কি বেশী দেরি হয় গা?

ভুবন চৌধুরী উঠিয়া বসিয়া একহাতে তাহার চিবুক ধরিয়া নিঃশব্দে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন। কারিগর যেমন করিয়া প্রতিমা সাজাইয়া, মাথায় মুকুট পরাইয়া দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে থাকে, একটু গর্ব, আর অনেকখানি স্নেহ সেই সুন্দর মুখখানির আশেপাশে জমা হইয়া উঠে, ভুবনবাবুরও ঠিক তেমনি হয়। কোনদিন বা তাঁহার অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আহা, ভাল করনি—

কি ভালো করিনি গো?

ভাবছি—এখানে তোমাকে সাজে না—

পার্বতী হাসিয়া উঠিয়া বলিত, খুব সাজে! আমাদের আবার সাজাসাজি কি?

বৃদ্ধ আবার শুইয়া পড়িয়া' যেন মনে মনে বলিতেন, তা বুঝি—তা বুঝি। তবে,

তোমার ভাল হবে। ভগবান তোমাকে দেখবেন।

এমনি করিয়া প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল। মধ্যে একবার চক্রবর্তী মহাশয় কন্যাকে লইতে আসিয়াছিলেন,—পার্বতী নিজেই ইচ্ছা করিয়া গেল না। পিতাকে কহিল, বাবা, বড় অগোছাল সংসার, আর কিছুদিন পরে যাব।

তিনি অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, মেয়েমানুষ এমনি জাতই বটে!

তিনি বিদায় হইলে পার্বতী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, আমার বড়মেয়েকে একবার নিয়ে এস।

মহেন্দ্র ইতস্ততঃ করিল। সে জানিত, যশোদা কিছুতেই আসিবে না। কহিল, বাবা একবার গেলে ভাল হয়।

ছিঃ! তা কি ভাল দেখায়! তার চেয়ে চল, আমরা মা-ব্যাটায় মেয়েকে নিয়ে আসি।

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল—তুমি যাবে?

ক্ষতি কি বাবা? আমার তাতে লজ্জা নাই; আমি গেলে যশোদা যদি আসে—যদি তার রাগ পড়ে, আমার যাওয়াটা কি এতই কঠিন!

কাজেই মহেন্দ্র পরদিন একাকী যশোদাকে আনিতে গেল। সেখানে সে কি কৌশল

করিয়াছিল জানি না, কিন্তু চারদিন পরে যশোদা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন পার্বতীর সর্বাঙ্গে বিচিত্র নূতন বহুমূল্য অলঙ্কার; এই সেদিন ভুবনবাবু কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিয়াছিলেন—পার্বতী আজ তাহাই পরিয়া বসিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে যশোদা ক্রোধ-অভিমানের অনেক কথা মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে আসিয়াছিল। নূতন বৌ দেখিয়া সে একবারে অবাক হইয়া গেল। সে-সব বিদ্বেষের কথা তাহার মনেই পড়িল না। শুধু অস্ফুটেই কহিল, এই!

পার্বতী যশোদার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। কাছে বসাইয়া হাতে পাখা লইয়া কহিল, মা, মেয়ের উপর নাকি রাগ করেচ?

যশোদার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া গেল। পার্বতী তখন সে সমস্ত অলঙ্কার একটির পর একটি করিয়া যশোদার অঙ্গে পরাইতে লাগিল। বিস্মিতা যশোদা কহিল, এ কি?

কিছুই না। শুধু তোমার মেয়ের সাধ।

গহনা পরিতে যশোদার মন্দ লাগিল না এবং পরা শেষ হইলে তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির আভাস দেখা দিল। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া নিরাভরণা পার্বতী কহিল, মা, মেয়ের উপর রাগ করেচ?

না, না—রাগ কেন? রাগ কি?—

তা বৈ কি মা, এ তোমার বাপের বাড়ি, এতবড় বাড়ি, কত দাসদাসীর দরকার। আমি একজন দাসী বৈ তো নয়! ছি মা, তুচ্ছ দাসদাসীর ওপর কি তোমার রাগ করা সাজে?

যশোদা বয়সে বড়, কিন্তু কথা কহিতে এখনো অনেক ছোট। সে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িল।বাতাস করিতে করিতে পার্বতী আবার কহিল,—দুঃখীর মেয়ে, তোমাদের দয়ায় এখানে একটু স্থান পেয়েচি। কত দীন, দুঃখী, অনাথ তোমাদের দয়ায় এখানে নিত্য প্রতিপালিত হয়; আমি তো মা, তাদেরই একজন। যে আশ্রিত—

যশোদা অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল, এখন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি মা —

পার্বতী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

যশোদা কহিল, দোষ নিও না মা।

পরদিন মহেন্দ্র যশোদাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, কি রে, রাগ থেমেচে?

যশোদা তাড়াতাড়ি দাদার পায়ে হাত দিয়া কহিল, দাদা, রাগের মাথায়—ছি ছি, কত কি বলেচি। দেখো যেন সে-সব প্রকাশ না পায়।

মহেন্দ্র হাসিতে লাগিল। যশোদা কহিল, আচ্ছা দাদা, সৎমায়ে এত যত্ন-আদর করতে পারে?

দিন-দুই পরে যশোদা পিতার নিকট নিজে কহিল, বাবা, ওখানে চিঠি লিখে দাও— আমি এখন দু'মাস এখান থেকে যাব না।

ভুবনবাবু একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কেন মা?

যশোদা লজ্জিতভাবে মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই—এখন দিনকতক ছোটমার কাছে থাকি!

আনন্দে বৃদ্ধের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সন্ধ্যার সময় পার্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েচ। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো।

পার্বতী কহিল, সে আবার কি?

কি, তা তোমাকে বোঝাতে পারিনে। নারায়ণ! কত লজ্জা, কত আত্মগ্লানি থেকে আজ আমাকে নিষ্কৃতি দিলে।

সন্ধ্যার আঁধারে পার্বতী দেখিল না যে, তাহার স্বামীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। আর বিনোদলাল—সে ভুবনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র, পরীক্ষা দিয়া সে বাড়ি আসিয়া আর পড়িতেই গেল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পর দুই-তিনদিন দেবদাস মিছামিছি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল—অনেকটা পাগলের মতো। ধর্মদাস কি কহিতে গিয়াছিল, তাহাকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া ধমকাইয়া উঠিল। গতিক দেখিয়া চুনিলালও কথা কহিতে সাহস করিল না। ধর্মদাস কাঁদিয়া বলিল, চুনিবাবু, কেন এমন হল?

চুনিলাল বলিল, কি হয়েচে ধর্মদাস?

একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভিতরের খবর দু'জনের কেহই জানে না। চোখ মুছিতে মুছিতে ধর্মদাস বলিল, চুনিবাবু, যেমন করে হোক দেব্‌তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। আর লেখাপড়া যদি করবে না, তো এখানে থেকে কি হবে?

কথাটা খুব সত্য। চুনিলাল চিন্তা করিতে লাগিল। চারি-পাঁচদিন পরে একদিন ঠিক তেমনি সন্ধ্যার সময় চুনিবাবু বাহির হইতেছিল—দেবদাস কোথা হইতে আসিয়া হাত ধরিল—চুনিবাবু, সেখানে যাচ্চ?

চুনিলাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে গেল, হাঁ—না, বল তো আর যাইনে।

দেবদাস কহিল, না, যেতে বারণ করচি নে; কিন্তু একটি কথা বল, কি আশায় সেখানে তুমি যাও?

আশা আর কি? এমনি সময় কাটে।

কাটে? কৈ, আমার সময় তো কাটে না। আমি সময় কাটাতে চাই।

চুনিলাল কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, বোধ করি তাহার মনের ভাব মুখে পড়িতে চেষ্টা করিল। তাহার পর কহিল, দেবদাস, তোমার কি হয়েচে খুলে বলতে পারো?

কিছুই তো হয়নি।

বলবে না?

না চুনি, বলবার কিছুই নেই। চুনিলাল বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া কহিল, দেবদাস, একটা কথা রাখবে?

কি?

সেখানে আর একবার তোমাকে যেতে হবে। আমি কথা দিয়েচি।

যেখানে সেদিন গিয়েছিলাম—সেইখানে তো?

হাঁ—

ছিঃ—আমার ভাল লাগে না।

যাতে ভাল লাগে, আমি করে দেব।

দেবদাস অন্যমনস্কের মতো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, চল যাই।

অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া দিয়া চুনিলাল কোথায় সরিয়া গিয়াছে। একা দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে নীচে বসিয়া মদ খাইতেছে। অদূরে বসিয়া চন্দ্রমুখী বিষণ্নমুখে চাহিয়া চাহিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল—দেবদাস, আর খেয়ো না।

দেবদাস মদের গ্লাস নীচে রাখিয়া ভ্রূকুটি করিল, কেন?

অল্পদিন মদ ধরেচ, অত সইতে পারবে না।

সহ্য করব বলে মদ খাইনে। এখানে থাকব বলে শুধু মদ খাই।

এ কথা চন্দ্রমুখী অনেকবার শুনিয়াছে। এক-একবার তাহার মনে হয়, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে রক্তগঙ্গা হইয়া মরে। দেবদাসকে সে ভালবাসিয়াছে। দেবদাস মদের গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিল। কৌচের পায়ায় লাগিয়া সেটা চূর্ণ হইয়া গেল। তখন আড় হইয়া বালিশে হেলান দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, আমার উঠে যাবার ক্ষমতা নেই, তাই এখানে বসে থাকি—জ্ঞান থাকে না, তাই তোমার মুখের পানে চেয়ে কথা কই—চন্দ—র—তবু অজ্ঞান হইনে—তবু একটু জ্ঞান থাকে—তোমাকে ছুঁতে পারিনে—আমার বড় ঘৃণা হয়।

চন্দ্রমুখী চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, দেবদাস, কত লোক এখানে আসে, তারা কখনো মদ স্পর্শও করে না।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিল। টলিয়া টলিয়া ইতস্ততঃ হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—স্পর্শ করে না? আমার বন্দুক থাকলে তাদের গুলি করতাম। তারা যে আমার চেয়েও পাপিষ্ঠ!—চন্দ্রমুখী!

কিছুক্ষণ থামিয়া কি যেন ভাবতে লাগিল; তাহার পর আবার কহিল, যদি কখনও মদ ছাড়ি—যদিও ছাড়ব না—তা হলে আর কখন ত এখানে আসব না। আমার উপায় আছে, কিন্তু তাদের কি হবে?

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিল, বড় দুঃখে মদ ধরেচি—আমাদের বিপদের, দুঃখের বন্ধু! আর তোমাকে ছাড়তে পারিনে,—

দেবদাস বালিশের উপর মুখ রগড়াইতে লাগিল। চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল। দেবদাস ভ্রূকুটি করিল—ছিঃ, ছুঁয়ো না—এখনো আমার জ্ঞান আছে। চন্দ্রমুখী, তুমি তো জান না—আমি শুধু জানি আমি কত যে তোমাদের ঘৃণা করি।

চিরকাল ঘৃণা করব—তবু আসব, তবু বসব, তবু কথা কব—না হলে যে উপায় নেই। তা কি তোমরা কেউ বুঝবে? হাঃ—হাঃ—লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে মাতাল হই—এমন উপযুক্ত স্থান জগতে কি আর আছে! আর তোমরা—

দেবদাস দৃষ্টি সংযত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার বিষণ্ন মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আহা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব—স্ত্রীলোকে যে কত সইতে পারে—তোমরাই তার দৃষ্টান্ত!

তাহার পর চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া, চুপি চুপি কহিতে লাগিল—চন্দ্রমুখী বলে, সে আমাকে ভালবাসে—আমি তা চাইনে—চাইনে—চাইনে—লোকে থিয়েটার করে, মুখে চুনকালি মাখে—চোর হয়—ভিক্ষা করে—রাজা হয়—রানী হয়—ভালবাসে—কত ভালবাসার কথা বলে—কত কাঁদে—ঠিক যেন সব সত্য! চন্দ্রমুখী আমার থিয়েটার করে, আমি দেখি। কিন্তু তাকে যে মনে পড়ে—একদণ্ডে কি যেন সব হয়ে গেল। কোথায় সে চলে গেল—আর কোন্‌পথে আমি চলে গেলাম। এখন একটা সমস্ত জীবনব্যাপী মস্ত অভিনয় আরম্ভ হয়েচে। একটা ঘোর মাতাল—আর এই একটা—হোক, তাই হোক—মন্দ কি! আশা নেই, ভরসা নেই—সুখও নেই, সাধও নেই—বাঃ! বহুৎ আচ্ছা—

তাহার পর দেবদাস পাশ ফিরিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।

চন্দ্রমুখী তাহা বুঝিতে পারিল না। অল্পক্ষণেই দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী তখন কাছে আসিয়া বসিল। অঞ্চল ভিজাইয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, সিক্ত বালিশ বদলাইয়া দিল। একটা পাখা লইয়া কিছুক্ষণ বাতাস করিয়া, বহুক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিল। রাত্রি তখন প্রায় একটা। দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুই ভাই দ্বিজদাস ও দেবদাস ও গ্রামের অনেকেই জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের সৎকার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। দ্বিজদাস চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া পাগলের মতো হইয়াছে—পাড়ার পাঁচজন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আর দেবদাস শান্তভাবে একটা থামের পার্শ্বে বসিয়া আছে। মুখে শব্দ নাই, চোখে এক ফোঁটা জল নাই। কেহ তাহাকে ধরিতেছে না—কেহ সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস করিতেছে না। মধুসূদন ঘোষ নিকটে গিয়া একবার বলিতে গিয়াছিল,—তা বাবা কপালে—

দেবদাস হাত দিয়া দ্বিজদাসের দিকটা দেখাইয়া বলিল, ওখানে। ঘোষজা মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া—হ্যাঁ, তা উনি—কত বড় লোক, ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আর কেহ নিকটে আসিল না। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে দেবদাস অর্ধমূর্ছিত জননীর পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিল। সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। পার্বতীর পিতামহীও উপস্থিত ছিলেন। ভাঙ্গাগলায় সদ্যবিধবা শোকার্ত জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বউমা, চেয়ে দেখ মা, দেবদাস এসেচে। দেবদাস ডাকিল, মা।

তিনি একবারমাত্র চাহিয়া বলিলেন, বাবা! তাহার পর নিমীলিত চোখের কোণ হইতে অজস্র অশ্রু বহিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের দল কলস্বরে রৈ-রাই করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবদাস জননীর চরণে কিছুক্ষণ মুখ ঢাকিয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। গেল মৃত পিতার শয়নকক্ষে। চোখে জল নাই, গম্ভীর শান্তমূর্তি। রক্তনেত্র ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। যে-কেহ সে মূর্তি দেখিতে পাইলে

বোধ করি ভীত হইত। কপালের দুই পার্শ্বে উভয় শিরা স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, বড় বড় রুক্ষ কেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ কালিমাখা হইয়াছে—কলিকাতার জঘন্য অত্যাচারের পর এই দীর্ঘ রাত্রিজাগরণ, তাহার পর পিতার মৃত্যু! এক বৎসর পূর্বে যে-কেহ তাহাকে দেখিয়াছিল—এখন বোধ হয় তাহাকে হঠাৎ সে চিনিতে পারিত না। কিছুক্ষণের পর পার্বতীর জননী সন্ধান করিয়া দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন—দেবদাস!

কেন খুড়ীমা?

এমন করলে তো চলবে না বাবা!

দেবদাস তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি করেচি খুড়ীমা?<

খুড়ীমা তাহা বুঝিলেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না। দেবদাসের মাথাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,— দেব্‌তা—বাবা!

কেন খুড়ীমা?

দেব্‌তা-চরণ—বাবা—

বুকের কাছে মুখ রাখিয়া দেবদাস এইবার এক ফোঁটা অশ্রুবিসর্জন করিল।

শোকার্ত পরিবারেরও দিন কাটে। ক্রমে প্রভাত হইল, কান্নাকাটি অনেক কমিয়া আসিল। দ্বিজদাস একেবারে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার জননীও উঠিয়া

বসিয়াছেন,—চোখ মুছিতে মুছিতে দিনের কাজ করিতেছেন। দুইদিন পরে দ্বিজদাস দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, দেবদাস, পিতার শ্রাদ্ধকার্যে কত ব্যয় করা উচিত?

দেবদাস অগ্রজের মুখপানে চাহিয়া কহিল, যেমন উচিত বিবেচনা করেন।

না ভাই, এখন শুধু আমার বিবেচনায় চলবে না। তুমি বড় হয়েচ, তোমার মত জানা আবশ্যক।

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কত নগদ টাকা আছে?

বাবার তবিলে দেড় লাখ টাকা জমা আছে। আমার বিবেচনায় হাজার-দশেক টাকা খরচ করলেই যথেষ্ট হবে—কি বল?

আমি কত পাব?

দ্বিজদাস একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, তা তুমিও অর্ধেক পাবে। দশ হাজার খরচ হলে, তোমার সত্তর হাজার ও আমার সত্তর হাজার থাকবে।

মা কি পাবেন?

মা নগদ টাকা কি করবেন? তিনি বাটীর গিন্নী—আমরা প্রতিপালন করব।

দেবদাস একটু চিন্তা করিয়া বলিল, আমার বিবেচনায়, আপনার ভাগের পাঁচ হাজার টাকা খরচ হোক এবং আমার ভাগের পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হবে৷ বাকি পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে আমি পঁচিশ হাজার নেব, বাকি পঁচিশ হাজার টাকা মায়ের নামে জমা থাকবে৷ আপনার কি বিবেচনা হয়?

প্রথমে দ্বিজদাস যেন লজ্জিত হইলেন; পরে কহিলেন, উত্তম কথা৷ কিন্তু আমার, কি জান,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে; তাদের বিয়ে, পৈতা দেওয়া,—অনেক খরচ৷ তা এই পরামর্শই ভাল৷ একটু থামিয়া বলিলেন, তা একটু লিখে দিলেই—লেখাপড়ার প্রয়োজন হবে কি? কাজটা ভাল দেখাবে না৷ আমার ইচ্ছা, টাকাকড়ির কথা—এ সময়ে গোপনেই হয়৷

তা ভাল কথা; কিন্তু কি জানো ভাই—

আচ্ছা, আমি লিখেই দিচ্চি৷ সেইদিনই দেবদাস লেখাপড়া করিয়া দিল৷

পরদিন দ্বিপ্রহরে দেবদাস নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির পার্শ্বে পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল৷ পার্বতী মুখপানে চাহিয়াছিল—চিনিতে যেন তাহার ক্লেশ হইতেছিল৷ দেবদাস গম্ভীর শান্তমুখে কাছে আসিয়া কহিল, কখন এলে পার্বতী?

সেই কণ্ঠস্বর! আজ তিন বৎসর পরে দেখা৷ অধোমুখে পার্বতী কহিল—সকালবেলা এসেচি৷

অনেকদিন দেখা হয়নি৷ বেশ ভাল ছিলে?

পার্বতী মাথা নাড়িল।

চৌধুরীমশায় ভাল আছেন? ছেলেমেয়েরা সব ভাল?

সব ভাল। পার্বতী একটিবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একটিবার জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, তিনি কেমন আছেন—কি করিতেছেন। এখন যে কোন প্রশ্নই খাটে না।

দেবদাস কহিল, এখন কিছুদিন আছ তো?

হাঁ।

তবে আর কি—বলিয়া দেবদাস বাহিরে চলিয়া গেল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেছে। সে কথা বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়, তাই তাহাতে প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধের পরদিবস পার্বতী ধর্মদাসকে নিভৃতে ডাকিয়া তাহার হাতে একগাছা সোনার হার দিয়া কহিল, ধর্ম, তোমার মেয়েকে পরতে দিয়ো—

ধর্মদাস মুখপানে চাহিয়া আর্দ্র চক্ষু আরো আর্দ্র করিয়া বলিল, আহা, তোমাকে কতদিন দেখিনি; সব ভাল খবর তো দিদি?

সব ভাল। তোমার ছেলেমেয়ে ভাল আছে?

তা আছে পারু।

তুমি ভাল আছ?

এইবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধর্ম্মদাস কহিল, কৈ আর ভাল! এইবার যেতে ইচ্ছে করে—কর্তা গেলেন। ধর্ম্মদাস শোকের আবেগে কত কি হয়ত কহিত, কিন্তু তাহাতে পার্বতী বাধা দিল। এ-সব সংবাদ শুনিবার জন্য সে হার দেয় নাই।

পার্বতী কহিয়া উঠিল, সে কি কথা ধর্ম, তুমি গেলে দেবদাদাকে দেখবে কে?

ধর্ম্মদাস কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, যখন ছেলেমানুষটি ছিল, তখন দেখেচি। এখন না দেখতে হলেই বাঁচি, পারু।

পার্বতী আরো নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, ধর্ম, একটি কথা সত্য বলবে?

কেন বলব না দিদি!

তবে সত্যি করে বল, দেবদা এখন কি করে?

করে আমার মাথা আর মুণ্ডু।

ধর্ম্মদাস, খুলে বল না?

ধর্মদাস পুনরায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, খুলে আর কি বলব দিদি! এ কি আর বলবার কথা! এবারে কর্তা নাই, দেব্‌তার হাতে অগাধ টাকা হল; এবারে কি আর রক্ষা থাকবে?

পার্বতীর মুখ একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে আভাসে-ইঙ্গিতে কিছু কিছু শুনিয়াছিল। শুষ্ক হইয়া কহিল, বল কি ধর্মদাস? সে মনোরমার পত্রে যখন কতক শুনিয়াছিল, তখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ধর্মদাস মাথা নাড়িয়া কহিতে লাগিল—আহার নাই, নিদ্রা নাই, শুধু বোতল বোতল মদ। তিনদিন, চারদিন ধরে কোথায় পড়ে থাকে—ঠিকানা নাই। কত টাকা উড়িয়ে দিলে,—শুনতে পাই, কত হাজার টাকার নাকি তাকে গয়না গড়িয়ে দিয়েচে।

পার্বতীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—ধর্মদাস, এ-সব সত্যি?

ধর্মদাস নিজের মনে কহিতে লাগিল,—তোর কথা হয়ত শুনতে পারে—একবার বারণ করে দে। কি শরীর কি হয়ে গেল—এমনধারা অত্যাচারে ক'টা দিন বা বাঁচবে? কাকেই বা এ কথা বলি? মা, বাপ, ভাই—এদের এ কথা বলা যায় না। ধর্মদাস শিরে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ইচ্ছে করে, মাথা খুঁড়ে মরি পারু, আর বাঁচতে সাধ নেই।

পার্বতী উঠিয়া গেল। নারাণবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এ বিপদের সময় দেবদাসের কাছে যাওয়া একবার উচিত। কিন্তু, তাহার এত সাধের দেবদাদা এই হইয়াছে! কত কথাই যে মনে পড়িতে লাগিল, তাহার অবধি নাই। যত ধিক্কার সে দেবদাসকে দিল, তাহার সহস্রগুণ আপনাকে দিল; সহস্রবার তাহার মনে হইল, সে থাকিলে কি এমন হইতে পারিত? আগেই সে

নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছিল, কিন্তু, সে কুঠার এখন তাহার মাথায় পড়িল। তাহার দেবদাদা এমন হইয়া যাইতেছে—এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত! পরকে আপনার ভাবিয়া সে নিত্য অন্ন বিতরণ করিতেছে, আর তাহার সর্বস্ব,—আজ অনাহারে মরিতেছে! পার্বতী প্রতিজ্ঞা করিল, আজ সে দেবদাসের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে!

এখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে,—পার্বতী দেবদাসের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবদাস শয্যায় বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল, চাহিয়া দেখিল। পার্বতী ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর বসিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া হাসিল। তাহার মুখ বিষণ্ন, কিন্তু শান্ত। হঠাৎ কৌতুক করিয়া কহিল, যদি অপবাদ দিই?

পার্বতী সলজ্জ, নীলোৎপল চক্ষু দুটি একবার তাহার পানে রাখিয়া, পরক্ষণেই অবনত করিল। মুহূর্তে বুঝাইয়া দিল, এ কথা তাহার বুকের মাঝে চিরদিনের জন্য শেলের মতো বিঁধিয়া আছে। আর কেন? কত কথা বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। দেবদাসের কাছে সে কথা কহিতে পারে না।

আবার দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, বুঝেচি রে, বুঝেচি! লজ্জা হচ্ছে, না?

তবুও পার্বতী কথা কহিতে পারিল না। দেবদাস কহিতে লাগিল, তাতে আর লজ্জা কি? দু'জনে মিলেমিশে একটা ছেলেমানুষী করে ফেলে—এই দেখ্‌দেখি——মাঝে থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বললি; আমিও কপালের ওপর ঐ দাগ দিয়ে দিলাম। কেমন হয়েচে!

দেবদাসের কথার ভিতর শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র ছিল না; প্রসন্ন হাসি-হাসি মুখে

অতীতের দুঃখের কাহিনী। পার্বতীর কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে কাপড় দিয়া, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনে মনে বলিল, দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল। তুমি আমাকে ভালবাসিতে—তাই দয়া করে, আমাদের বাল্য-ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েচ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।

পারু!

মুখ হইতে অঞ্চল না খুলিয়া পার্বতী কহিল, কি?

তোর উপর আমার বড় রাগ হয়—

এইবার দেবদাসের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইতে লাগিল—বাবা নাই, আজ আমার কি দুঃখের দিন; কিন্তু তুই থাকলে কি ভাবনা ছিল! বড়বৌকে জানিস ত, দাদার স্বভাবও কিছু তোর কাছে লুকানো নেই; বল্‌দেখি, মাকে নিয়ে এ সময়ে কি করি! আর আমারই বা যে কি হবে, কিছুই বুঝে পাই না। তুই থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে—সব তোর হাতে ফেলে দিয়ে—ও কি রে পারু!

পার্বতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দেবদাস কহিল, কাঁদছিস বুঝি? তবে আর বলা হল না।

পার্বতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বল।

দেবদাস মুহূর্তে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, পারু, তুই নাকি খুব পাকা গিন্নী হয়েচিস রে?

ভিতরে ভিতরে পার্বতী চাপিয়া অধর দংশন করিল; মনে মনে বলিল, ছাই গৃহিণী! শিমুলফুল দেবসেবায় লাগে কি?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; হাসিয়া কহিল—বড় হাসি পায়! ছিলি তুই এতটুকু—কত বড় হলি। বড় বাড়ি, বড় জমিদারি, বড় বড় ছেলেমেয়ে—আর চৌধুরীমশাই, সবাই বড়—কি রে পারু!

চৌধুরীমশাই পার্বতীর বড় আমোদের জিনিস; তাঁকে মনে হইলেই তাহার হাসি পাইত। এত কষ্টেও তাই তার হাসি আসিল।

দেবদাস কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, একটা উপকার করতে পারিস?

পার্বতী মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

তোদের দেশে ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

পার্বতী ঢোক গিলিয়া, কাশিয়া বলিল—ভাল মেয়ে? কি করবে?

পেলে বিয়ে করি। একবার সংসারী হতে সাধ হয়।

পার্বতী ভালমানুষটির মতো কহিল, খুব সুন্দরী তো?

হাঁ, তোর মতো।

আর খুব ভালমানুষ?

না, খুব ভালমানুষে কাজ নেই—বরং একটু দুষ্টু,—তোর মতো আমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারবে।

পার্বতী মনে মনে কহিল, সে তো কেউ পারবে না দেবদাদা; কেননা তাতে আমার মতো ভালবাসতে পারা চাই। মুখে কহিল, পোড়ার মুখ আমার, আমার মতো কত হাজার তোমার পায়ে আসতে পেলে ধন্য হয়।

দেবদাস কৌতুক করিয়া হাসিয়া বলিল, একটি আপাততঃ দিতে পারিস দিদি?

দেবদাদা, সত্যি বিয়ে করবে?

এই যে বললাম।

শুধু এইটি সে খুলিয়া বলিল না যে, তাকে ভিন্ন এ জীবনে অন্য স্ত্রীলোকে তার প্রবৃত্তি হইবে না।

দেবদাদা, একটি কথা বলব?

কি?

পার্বতী আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি মদ খেতে শিখলে কেন?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, খেতে কি কোন জিনিস শিখতে হয়?

তা নয়, অভ্যাস করলে কেন?

কে বলেচে, ধর্ম্মদাস?

যেই বলুক, কথাটা কি সত্যি?

দেবদাস প্রতারণা করিল না; কহিল, কতকটা বটে।

পার্বতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দিয়েচ, না?

দেবদাস হাসিয়া কহিল, দিইনি, গড়িয়ে রেখেচি। তুই নিবি?

পার্বতী হাত পাতিয়া বলিল, দাও। এই দেখ, আমার একটিও গয়না নেই।

চৌধুরীমশাই তোকে দেননি?

দিয়েছিলেন; আমি সমস্ত তাঁর বড়মেয়েকে দিয়ে দিয়েচি।

তোর বুঝি দরকার নেই?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া মুখ নিচু করিল।

এইবার সত্যই দেবদাসের চোখে জল আসিতেছিল। দেবদাস অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিল, কম দুঃখে আর স্ত্রীলোকে নিজের গহনা খুলিয়া বিলাইয়া দেয় না। কিন্তু চোখের জল চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মিছে কথা, পারু। কোন স্ত্রীলোককেই আমি ভালবাসিনি, কাউকেই গয়না দিইনি।

পার্বতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, তাই আমি বিশ্বাস করি।

অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর পার্বতী কহিল, কিন্তু, প্রতিজ্ঞা কর—আর মদ খাবে না!

তা পারিনে। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করতে পার, আমাকে আর একটিবারও মনে করবে না?

পার্বতী কথা কহিল না। এই সময়ে বাহিরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি হইল। দেবদাস চকিত হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া কহিল, সন্ধ্যা হল, এখন বাড়ি যা পারু!

আমি যাব না। তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

আমি পারিনে।

কেন পার না?

সবাই কি সব কাজ পারে?

ইচ্ছে করলে নিশ্চয় পারে।

তুমি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পার?

পার্বতীর সহসা যেন হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতসারে অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তা কি হয়?

দেবদাস শয্যার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, পার্বতী, দোর খুলে দাও।

পার্বতী সরিয়া আসিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিল, প্রতিজ্ঞা কর!

দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরভাবে কহিতে লাগিল— পারু, জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করানটা কি ভাল, না, তাতে বিশেষ লাভ আছে? আজকার প্রতিজ্ঞা কাল হয়ত থাকবে না— কেন আমাকে আর মিথ্যাবাদী করবি?

আবার বহুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। এমনি সময়ে কোথায় কোন্‌ঘরের

ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। দেবদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কহিল, ওরে পারু, দোর খুলে দে—

পার্বতী কথা কহে না।

ও পারু—

আমি কিছুতেই যাব না, বলিয়া পার্বতী অকস্মাৎ রুদ্ধ—আবেগে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল—বহুক্ষণ ধরিয়া বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল। ঘরের ভিতর এখন গাঢ় অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। দেবদাস শুধু অনুমান করিয়া বুঝিল, পার্বতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে ডাকিল—পারু!

পার্বতী কাঁদিয়া উত্তর দিল, দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট!

দেবদাস কাছে সরিয়া আসিল। তাহার চক্ষেও জল—কিন্তু, স্বর বিকৃত হইতে পায় নাই। কহিল, তা কি আর জানিনে রে?

দেবদা, আমি যে মরে যাচ্ছি। কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার যে আজন্মের সাধ—

অন্ধকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস কহিল—তারও তো সময় আছে।

তবে আমার কাছে চল; এখানে তোমাকে দেখবার যে কেউ নেই!

তোর বাড়ি গেলে খুব যত্ন করবি?

আমার ছেলেবেলার সাধ! স্বর্গের ঠাকুর! আমার এ সাধটি পূর্ণ করে দাও! তারপর মরি—তাতেও দুঃখ নেই।

এবার দেবদাসের চোখেও জল আসিয়া পড়িল।

পার্বতী পুনরায় কহিল, দেবদা, আমার বাড়ি চল।

দেবদাস চোখ মুছিয়া বলিল, আচ্ছা যাব।

আমাকে ছুঁয়ে বল, যাবে?

দেবদাস অনুমান করিয়া পার্বতীর পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, এ কথা কখনও ভুলব না। আমাকে যত্ন করলে যদি—তোমার দুঃখ ঘোচে—আমি যাব। মরবার আগেও আমার এ কথা স্মরণ থাকবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পিতার মৃত্যুর পর ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত বাটীতে থাকিয়া, দেবদাস একেবারে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সুখ নাই, শান্তি নাই, একান্ত একঘেয়ে জীবন।তার উপর ক্রমাগত পার্বতীর চিন্তা; আজকাল সব কাজেই তাহাকে মনে পড়ে। আর, ভাই দ্বিজদাস এবং পতিব্রতা ভ্রাতৃজায়া দেবদাসের জ্বালা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন।

গৃহিণীর অবস্থাও দেবদাসের ন্যায়। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত সুখই ফুরাইয়া গিয়াছে। পরাধীনভাবে এ বাড়ি তাঁহার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ কয়দিন হইতে তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করিতেছেন; শুধু দেবদাসের বিবাহ না দিয়া যাইতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন—দেবদাস, একটি বিয়ে কর—আমি দেখে যাই।কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? একে অশৌচ অবস্থা, তার উপর আবার মনোমতো পাত্রীর সন্ধান করিতে হইবে। আজকাল তাই গৃহিণীর মাঝে মাঝে দুঃখ হয় যে, সে-সময় পার্বতীর সহিত বিবাহ দিলেই বেশ হইত। একদিন তিনি দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, দেবদাস, আর তো পারিনে—দিন কতক কাশী গেলে হয়। দেবদাসেরও তাই ইচ্ছা; কহিল আমিও তাই বলি। ছয় মাস পরে ফিরে এলেই হবে।

হাঁ বাবা, তাই কর। শেষে ফিরে এসে, তাঁর কাজ হয়ে গেলে, তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখে, আমি কাশীবাস করব।

দেবদাস স্বীকৃত হইয়া, জননীকে কিছুদিনের জন্য কাশীতে রাখিয়া আসিয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া তিন-চারদিন ধরিয়া দেবদাস চুনিলালের সন্ধান করিল। সে নাই, বাসা পরিবর্তন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় দেবদাস চন্দ্রমুখীর কথা স্মরণ করিল। একবার দেখা করিলে হয় না? এতদিন তাহাকে মোটেই মনে পড়ে নাই। দেবদাসের যেন একটু লজ্জা করিল, একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই চন্দ্রমুখীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল—এখানে নয়।

সম্মুখে একটা গ্যাসপোস্ট ছিল, দেবদাস তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, বলতে পার সে স্ত্রীলোকটি কোথায় গেছে?

জানালা খুলিয়া কিছুক্ষণ সে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, তুমি কি দেবদাস?

হাঁ।

দাঁড়াও দোর খুলে দিই।

দ্বার খুলিয়া সে কহিল, এস—

কণ্ঠস্বর যেন কতকটা পরিচিত, অথচ ভাল চিনিতে পারিল না। একটু অন্ধকারও হইয়াছিল। সন্দেহে কহিল, চন্দ্রমুখী কোথায় বলতে পার?

স্ত্রীলোকটি মৃদু হাসিয়া কহিল, পারি; ওপরে চল।

এবার দেবদাস চিনিতে পারিল—অ্যাঁ, তুমি?

হাঁ আমি। দেবদাস, আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?

উপরে গিয়া দেবদাস দেখিল, চন্দ্রমুখীর পরনে কালাপেড়ে ধুতি, কিন্তু মলিন। হাতে

২——৫

৬৬

শুধু দু'গাছি বালা, অন্য অলঙ্কার নাই। মাথার চুল এলোমেলো। বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী পূর্বাপেক্ষা অনেক কৃশ হইয়াছে। কহিল, তোমার অসুখ হয়েছিল?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া কহিল, শারীরিক একটুও নয়। তুমি ভাল করে বোস।

দেবদাস শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিল, ঘরটির একেবারে আগাগোড়া পরিবর্তন হইয়াছে। গৃহস্বামিনীর মতো তাহারও দুর্দশার সীমা নাই। একটিও আসবাব নাই—আলমারি, টেবিল, চেয়ারের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। শুধু একটি শয্যা; চাদর অপরিষ্কৃত, দেয়ালের গায়ে ছবিগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, লোহার কাঁটি এখনো পোঁতা আছে, দুই-একটায় লাল ফিতা এখনও ঝুলিতেছে। উপরের সেই ঘড়িটা এখনো ব্রাকেটের উপর আছে, কিন্তু নিঃশব্দ। আশেপাশে মাকড়সা মনের মতো করিয়া জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। এক কোণে একটা তৈলদীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে—তাহারই সাহায্যে দেবদাস নূতন ধরনের গৃহসজ্জা দেখিয়া লইল। কিছু বিস্মিত, কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, চন্দ্র, এমন দুর্দশা কেমন করে হল?

চন্দ্রমুখী ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল, দুর্দশা তোমাকে কে বললে? আমার তো ভাগ্য খুলেচে।

দেবদাস বুঝিতে পারিল না; কহিল, তোমার গায়ের গয়নাই বা গেল কোথায়?

বেচে ফেলেচি।

আসবাবপত্র?

তাও বেচেচি।

ঘরের ছবিগুলোও বিক্রি করেচ?

এবার চন্দ্রমুখী হাসিয়া সম্মুখের একটা বাড়ি দেখাইয়া কহিল, ও বাড়ির ক্ষেত্রমণিকে বিলিয়ে দিয়েচি।

দেবদাস কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুনিবাবু কোথায়?

বলতে পারিনে। মাস-দুই হল ঝগড়া করে চলে গেছে, আর আসেনি।

দেবদাস আরও আশ্চর্য হইল—ঝগড়া কেন?

চন্দ্রমুখী কহিল, ঝগড়া কি হয় না?

হয়। কিন্তু কেন?

দালালি করতে এসেছিল, তাই তাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

কিসের দালালি?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল,পাটের। তার পর কহিল, তুমি বুঝতে পার না কেন? একজন বড়লোক ধরে এনেছিল, মাসে দু'শ টাকা, একরাশ অলঙ্কার, আর দরজার সুমুখে এক সেপাই। বুঝলে?

দেবদাস বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, কৈ, সে-সকল তো দেখিনে?

থাকলে তো দেখবে! আমি তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

তাদের অপরাধ?

অপরাধ বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু আমার ভাল লাগল না। দেবদাস বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিল, সেই পর্যন্ত আর কেউ এখানে আসেনি?

না। সেই পর্যন্ত কেন, তুমি যাবার পরদিন থেকেই এখানে কেউ আসে না। শুধু চুনি মাঝে মাঝে এসে বসত, কিন্তু মাস-দুই থেকে তাও বন্ধ।

দেবদাস বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে

কহিল, চন্দ্রমুখী, তবে দোকানপাট সব তুলে দিলে?

হাঁ—দেউলে হয়ে পড়েচি।

দেবদাস সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিল, কিন্তু খাবে কি করে?

এই যে শুনলে কিছু গহনাপত্র ছিল, বিক্রি করেচি।

সে আর কত?

বেশী নয়। প্রায় আট-ন'শ টাকা আমার আছে। একজন মুদীর কাছে রেখে দিয়েচি—সে আমাকে মাসে কুড়ি টাকা দেয়।

কুড়ি টাকায় আগে তো তোমার চলত না?

না, আজও ভাল চলে না। তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি, তাই মনে করচি, হাতের এই দু'গাছা বালা বিক্রি করে, সমস্ত পরিশোধ করে দিয়ে আর কোথাও চলে যাব।

কোথায় যাবে?

তা এখনো স্থির করিনি। কোন সস্তা মুলুকে যাব—কোন পাড়াগ্রামে—যেখানে কুড়ি টাকায় মাস চলে।

এতদিন যাওনি কেন? যদি সত্যই তোমার আর-কিছু প্রয়োজন নেই তো এতদিন মিথ্যা কেন ধার-কর্জ বাড়ালে?

চন্দ্রমুখী নতমুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল। তাহার জীবনে এ কথাটা বলিতে আজ তাহার প্রথম লজ্জা করিল। দেবদাস বলিল, চুপ করলে যে?

চন্দ্রমুখী শয্যার একপ্রান্তে সঙ্কুচিতভাবে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—রাগ করো না; যাবার আগে আশা করেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হয়। ভাবতাম, তুমি হয়ত আর-একবার আসবে। আজ তুমি এসেচ, এখন কালই যাবার উদ্যোগ করব। কিন্তু কোথায় যাই, বলে দেবে?

দেবদাস বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল; কহিল, শুধু আমাকে দেখবার আশায়? কিন্তু কেন?

একটা খেয়াল। তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করতে। এত ঘৃণা কেউ কখনো করেনি, বোধ হয় তাই। আজ তোমার মনে পড়বে কিনা জানিনে, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে,—যেদিন তুমি এখানে প্রথম এলে, সেইদিন থেকেই তোমার উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। তুমি ধনীর সন্তান তা জানতাম; কিন্তু ধনের আশায় তোমার পানে আকৃষ্ট হইনি। তোমার পূর্বে কত লোক এখানে এসেচে গেছে, কিন্তু কারো ভিতরে কখনো তেজ দেখিনি। আর তুমি এসেই আমাকে আঘাত করলে; একটা অযাচিত, উপযুক্ত অথচ অনুচিত রূঢ় ব্যবহার; ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইলে, শেষে তামাশার মতো কিছু দিয়ে গেলে। এসব মনে পড়ে কি?

দেবদাস চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রমুখী পুনরায় কহিতে লাগিল, সেই অবধি তোমার

প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। ভালবেসে নয়, ঘৃণা করেও নয়। একটা নূতন জিনিস দেখলে যেমন তা খুব মনে থাকে, তোমাকেও তাই কিছুতেই ভুলতে পারিনি—তুমি এলে বড় ভয়ে ভয়ে সতর্ক হয়ে থাকতাম, কিন্তু না এলে কিছুই ভাল লাগত না। তার পর আবার কি যে মতিভ্রম ঘটল—এই দুটো চোখে অনেক জিনিসই আর একরকম দেখতে লাগলাম। পূর্বের 'আমি'র সঙ্গে এমন করে বদলে গেলাম—যেন সে 'আমি' আর নয়। তার পরে তুমি মদ ধরলে। মদে আমার বড় ঘৃণা। কেউ মাতাল হলে তার ওপর বড় রাগ হত। কিন্তু তুমি মাতাল হলে রাগ হত না; কিন্তু বড্ড দুঃখ পেতাম।—বলিয়া চন্দ্রমুখী দেবদাসের পায়ের উপর হাত রাখিয়া ছলছল চক্ষে কহিল, আমি বড় অধম, আমার অপরাধ নিয়ো না। তুমি যে কত কথা কইতে, কত বড় ঘৃণায় সরিয়ে দিতে; আমি কিন্তু তোমার তত কাছে যেতে চাইতাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লে—থাক্‌সে-সব বলব না, হয়ত আবার রাগ করে বসবে।

দেবদাস কিছুই কহিল না—নূতন ধরনের কথাবার্তা তাহাকে কিছু ক্লেশ দিতেছিল। চন্দ্রমুখী গোপনে চক্ষু মুছিয়া কহিতে লাগিল, একদিন তুমি বললে—আমরা কত সহ্য করি। লাঞ্ছনা, অপমান—জঘন্য অত্যাচার, উপদ্রবের কথা—সেইদিন থেকেই বড় অভিমান হয়েচে—আমি সব বন্ধ করে দিয়েচি।

দেবদাস উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু দিন চলবে কি করে?

চন্দ্রমুখী কহিল, সে তো আগেই বলেচি।

মনে কর, সে যদি তোমার সমস্ত টাকা ফাঁকি দেয়—

চন্দ্রমুখী ভয় পাইল না। শান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য নয়, কিন্তু তাও ভেবেচি।

বিপদে পড়লে তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চেয়ে নেব।

দেবদাস ভাবিয়া কহিল, তাই নিয়ো। এখন আর কোথাও যাবার উদ্যোগ কর।

কালই করব। বালা দু'গাছা বেচে, একবার মুদীর সঙ্গে দেখা করব।

দেবদাস পকেট হইতে পাঁচখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বালিশের তলে রাখিয়া কহিল,—বালা বিক্রি করো না, তবে মুদীর সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু যাবে কোথায়? কোন তীর্থস্থানে?

না দেবদাস। তীর্থধর্মের উপর আমার তত আস্থা নেই। কলকাতা থেকে বেশি দূরে যাব না, কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে থাকব।

কোন ভদ্র-পরিবারে কি দাসীবৃত্তি করবে?

চন্দ্রমুখীর চোখে আবার জল আসিল। মুছিয়া কহিল, প্রবৃত্তি হয় না। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে থাকব। কেন দুঃখ করতে যাব? শরীরের দুঃখ কোনদিন সইনি, এখনো সইতে পারব না। আর বেশী টানাটানি করলে হয়ত ছিঁড়ে যাবে।

দেবদাস বিষণ্ণমুখে ঈষৎ হাসিল; কহিল, কিন্তু শহরের কাছে থাকলে আবার হয়ত প্রলোভনে পড়বে—মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই।

এবার চন্দ্রমুখীর মুখ প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া কহিল, সে কথা সত্যি, মানুষের মনকে

বিশ্বাস নেই বটে, কিন্তু আমি আর প্রলোভনে পড়ব না। স্ত্রীলোকের লোভ বড় বেশী তাও মানি, কিন্তু যা-কিছু লোভের জিনিস যখন ইচ্ছে করেই ত্যাগ করচি তখন আর আমার ভয় নেই। হঠাৎ যদি ঝোঁকের ওপর ছাড়তাম, তাহলে হয়ত সাবধান হবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু এতদিনের মধ্যে একটা দিনও তো আমাকে অনুতাপ করতে হয়নি। আমি যে বেশ সুখে আছি।

তথাপি দেবদাস মাথা নাড়িল; কহিল, স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল—বড় অবিশ্বাসী।

এবার চন্দ্রমুখী একেবারে কাছে আসিয়া বসিল। হাত ধরিয়া কহিল, দেবদাস!

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিল, এখন আর বলিতে পারিল না—আমাকে স্পর্শ করো না।

চন্দ্রমুখী স্নেহ-বিস্ফারিত চক্ষে, ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে, তাহার হাত দুটি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, আজ শেষ দিন, আজ আর রাগ করো না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার বড় সাধ হয়।—বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে দেবদাসের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, পার্বতী তোমাকে কি বড় বেশী আঘাত করেচে?

দেবদাস ভ্রূকুটি করিল, বলিল, এ কথা কেন?

চন্দ্রমুখী বিচলিত হইল না। শান্ত দৃঢ়-স্বরে বলিল, আমার কাজ আছে। তোমাকে সত্যি বলচি, তুমি দুঃখ পেলে আমারও বড় বাজে। তা ছাড়া আমি বোধ হয় অনেক কথাই জানি। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে তোমার মুখ থেকে অনেক কথাই শুনেচি।

কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস হয় না যে, পার্বতী তোমাকে ঠকিয়েচে। বরঞ্চ মনে হয়, তুমি নিজেই নিজেকে ঠকিয়েচ। দেবদাস, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, এ সংসারে অনেক জিনিস দেখেচি। আমার কি মনে হয় জান? নিশ্চয় মনে হয়, তোমারই ভুল হয়েচে। মনে হয়, চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বলে স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়। অখ্যাতি করতেও তোমরা, সুখ্যাতি করতেও তোমরা। তোমাদের যা বলবার—অনায়াসে বল; কিন্তু তারা তা পারে না। নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না; পারলেও, তা সবাই বোঝে না। কেননা, বড় অস্পষ্ট হয়—তোমাদের মুখের কাছে চাপা পড়ে যায়। তার পরে অখ্যাতিটাই লোকের মুখে মুখে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

চন্দ্রমুখী একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল, এ জীবনে ভালবাসার ব্যবসা অনেকদিন করেচি, কিন্তু একটিবার মাত্র ভালবেসেচি। সে ভালবাসার অনেক মূল্য। অনেক শিখেচি, জান তো ভালবাসা এক, আর রূপের মোহ আর। এ দু'য়ে বড় গোল বাধে, আর পুরুষেই বেশী গোল বাধায়। রূপের মোহটা তোমাদের চেয়ে আমাদের নাকি অনেক কম, তাই একদণ্ডেই আমরা তোমাদের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠিনে। তোমরা এসে যখন ভালবাসা জানাও, কত কথায়, কত ভাবে যখন প্রকাশ কর, আমরা চুপ করে থাকি। অনেক সময় তোমাদের মনে ক্লেশ দিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, সঙ্কোচে বাধে। মুখ দেখতেও যখন ঘৃণা বোধ হয়, তখনও হয়ত লজ্জায় বলতে পারিনে—আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না।

তার পরে একটা বাহ্যিক প্রণয়ের অভিনয় চলে; একদিন, যখন তা শেষ হয়ে যায়, পুরুষমানুষ রেগে অস্থির হয়ে বলে, কি বিশ্বাসঘাতক! সবাই সেই কথা শোনে,সেই কথাই বোঝে। আমরা তখনও চুপ করে থাকি। মনে কত ক্লেশ হয়, কিন্তু কে তা

দেখতে যায়?

দেবদাস কোন কথা কহিল না। সেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়ত একটা মমতা জন্মায়; স্ত্রীলোক মনে করে এই বুঝি ভালবাসা! শান্ত ধীরভাবে সংসারের কাজকর্ম করে, দুঃখের সময় প্রাণপণে সাহায্য করে, তোমরা কত সুখ্যাতি কর,—মুখে মুখে তার কত ধন্য ধন্য! কিন্তু হয়ত তখনো তার ভালবাসার বর্ণপরিচয় হয় না।

তার পরে যদি কোন অশুভ মুহূর্তে তাহার বুকের ভেতরটা অসহ্য বেদনায় ছটফট করে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন—বলিয়া সে দেবদাসের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তখন তোমরা চিৎকার করে বলে ওঠো—কলঙ্কিনী! ছিঃ ছিঃ!

অকস্মাৎ দেবদাস চন্দ্রমুখীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—চন্দ্রমুখী, ও কি!

চন্দ্রমুখী ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই দেবদাস, আমি তোমার পার্বতীর কথা বলচি নে। বলিয়া সে মৌন হইল!

দেবদাসও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কের মতো কহিল, কিন্তু কর্তব্য আছে তো! ধর্মাধর্ম আছে তো!

চন্দ্রমুখী বলিল, তা তো আছেই। আর আছে বলেই, দেবদাস, যে যথার্থ ভালবাসে, সে সহ্য করে থাকে। শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি—যে টের

পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ-অশান্তি আনতে চায় না। কিন্তু কি বলছিলাম দেবদাস,—আমি নিশ্চয় জানি, পার্বতী তোমাকে একবিন্দুও ঠকায়নি, তুমি আপনাকেই ঠকিয়েচ। আজ এ-কথা বোঝবার তোমার সাধ্য নেই আমি জানি; কিন্তু যদি কখনো সময় আসে, তখন হয়ত দেখতে পাবে, আমি সত্য কথাই বলেছিলাম।

দেবদাসের দু'চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আজ কেমন করিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, চন্দ্রমুখীর কথাই সত্য। এই চোখের জল চন্দ্রমুখী দেখিতে পাইল, কিন্তু মুছাইবার চেষ্টা করিল না। মনে মনে বলিতে লাগিল, তোমাকে আমি অনেকবার অনেকরকমে দেখেচি, আমি তোমার মন জানি। বেশ বুঝেচি, সাধারণ পুরুষের মতো তুমি সেধে ভালবাসা জানাতে পারবে না। তবে রূপের কথা—রূপ কে না ভালবাসে?

কিন্তু তাই বলেই যে তোমার অতখানি তেজ রূপের পায়ে আত্মবিসর্জন করে ফেলবে, সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। পার্বতী হয়ত খুব রূপবতী; কিন্তু, তবু মনে হয়, সে-ই তোমাকে আগে ভালবেসেছিল, আগে সে-কথা জানিয়েছিল।

মনে মনে বলিতে বলিতে সহসা তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইয়া পড়িল, নিজেকে দিয়েই বুঝেচি, সে তোমাকে কত ভালবাসে!

দেবদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি বললে?

চন্দ্রমুখী কহিল, কিছু না। বলছিলাম যে, সে তোমার রূপে ভোলেনি। তোমার রূপ আছে বটে, কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র রুক্ষ রূপ সকলের চোখেও পড়ে না। কিন্তু যার পড়ে, সে আর চোখ ফিরুতে পারে না।— বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া বলিল, তুমি যে কি আকর্ষণ, তা যে কখন তোমাকে ভালবেসেছে সে জানে। এই স্বর্গ থেকে সাধ করে ফিরে যাবে, এমন মেয়েমানুষ কি পৃথিবীতে আছে!

আবার কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল,—এ রূপ তো চোখে পড়ে না! বুকের একেবারে মাঝখানটিতে এর গভীর ছায়া পড়ে। তার পরে দিন শেষ হলে আগুনের সঙ্গে চিতায় ছাই হয়ে যায়।

দেবদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, আজ এ-সব তুমি কি বলচ?

চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া বলিল, এমন বিপদ আর নেই দেবদাস, যাকে ভালবাসি না সে যদি জোর করে ভালবাসার কথা শোনায়! কিন্তু আমি শুধু পার্বতীর জন্য ওকালতি করছিলাম—নিজের জন্য নয়।

দেবদাস উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিল, এবার আমি যাই।

আর একটু বসো। কখনো তোমাকে সজ্ঞানে পাইনি, কখনো এমন করে হাত-দুটি ধরে কথা বলতে পাইনি—এ কি তৃপ্তি! বলিয়াই হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

দেবদাস আশ্চর্য হইয়া কহিল, হাসলে যে?

ও কিছুই নয়, শুধু একটা পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। সে আজ দশ বছরের কথা—যখন আমি ভালবেসে ঘর ছেড়ে চলে আসি। তখন মনে হতো, কত না

ভালবাসি, বুঝি প্রাণটাও দিতে পারি। তার পর একদিন তুচ্ছ একটা গয়না নিয়ে দু'জনের এমনি ঝগড়া হয়ে গেল যে, আর কখনো কেউ কারো মুখ দেখলাম না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, সে আমাকে মোটেই ভালবাসত না,—না হলে একটা গয়না দেয় না!

আর একবার চন্দ্রমুখী নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই শান্ত গম্ভীরমুখে মৃদু মৃদু কহিল—ছাই গয়না! তখন কি জানতাম, একটু সামান্য মাথাধরা সারাবার জন্যেও অকাতরে এই প্রাণটা পর্যন্ত দেওয়া যায়! তখন না বুঝতাম সীতা-দময়ন্তীর ব্যথা, না বিশ্বাস করতাম জগাই-মাধাইয়ের কথা। আচ্ছা দেবদাস, এ জগতে সকলই সম্ভব, না?

দেবদাস কিছুই বলিতে পারিল না; হতবুদ্ধির মতো ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি যাই—

ভয় কি, আরো একটু বসো। আমি তোমাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাইনে—সেদিন আমার কেটে গেছে। এখন তুমিও আমাকে যতখানি ঘৃণা কর, আমিও আমাকে ততখানি ঘৃণা করি; কিন্তু দেবদাস, একটা বিয়ে কর না কেন?

এতক্ষণে দেবদাসের যেন নিশ্বাস পড়িল; একটু হাসিয়া কহিল, উচিত বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না।

না হলেও কর। ছেলেমেয়ের মুখ দেখলেও অনেক শান্তি পাবে। তাছাড়া আমারও একটা উপায় হয়। তোমার সংসারে দাসীর মতো থেকেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারব।

দেবদাস সহাস্যে কহিল, আচ্ছা তখন তোমাকে ডেকে আনব।

চন্দ্রমুখী তাহার হাসি যেন দেখিতেই পাইল না; কহিল, দেবদাস, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে।

কি?

তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কইলে কেন?

কোন দোষ হয়েচে কি?

তা জানিনে। কিন্তু নতুন বটে! মদ খেয়ে জ্ঞান না হারালে, কখনো তো পূর্বে আমার মুখ দেখতে না!

দেবদাস সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বিষণ্নমুখে কহিল, এখন মদ ছুঁতে নেই—আমার পিতার মৃত্যু হয়েচে।

চন্দ্রমুখী বহুক্ষণ করুণচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এর পরে আর খাবে কি?

বলতে পারিনে।

চন্দ্রমুখী তাহার হাত দুটি আর একটু টানিয়া লইয়া অশ্রু-ব্যাকুল স্বরে কহিল, যদি

পার ছেড়ে দিয়ো, অসময়ে এমন সোনার প্রাণ নষ্ট করো না।

দেবদাস সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি চললাম। যেখানে যাও, সংবাদ দিয়ো—আর যদি কখনও কিছু প্রয়োজন হয়, আমাকে লজ্জা করো না।

চন্দ্রমুখী প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বলিল, আশীর্বাদ কর, যেন সুখী হই। আর একটা ভিক্ষা,—ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন দাসীর প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ করো।

আচ্ছা।—বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল। চন্দ্রমুখী যুক্তকরে কাঁদিয়া বলিল, ভগবান! আর একবার যেন দেখা হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বৎসর-দুই হইল পার্বতী মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। জলদবালা বুদ্ধিমতী ও কর্মপটু। পার্বতীর পরিবর্তে সংসারের অনেক কাজ সে-ই করে। পার্বতী এখন অন্যদিকে মন দিয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। নিজের ছেলেপুলে নাই বলিয়া পরের ছেলেমেয়েদের উপর তাহার বড় টান। গরীব-দুঃখীর কথা দূরে থাক, যাহাদের কিছু সংস্থান আছে, তাহাদিগের পুত্র-কন্যারও অধিকাংশ ব্যয়ভার সে-ই বহন করে। ইহা ভিন্ন ঠাকুরবাড়ির কাজ করিয়া, সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, অন্ধ-খঞ্জের পরিচর্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। স্বামীকে প্রবৃত্তি দিয়া পার্বতী আর একটা অতিথিশালা নির্মাণ করাইয়াছে। সেখানে নিরাশ্রয়, অসহায় লোক ইচ্ছামতো থাকিতে পারে—জমিদার-সংসার হইতেই তাহার খাওয়া-পরা মিলে। আর একটা কাজ পার্বতী বড় গোপনে করে, স্বামীকেও তাহা জানিতে দেয় না। দরিদ্র ভদ্র-পরিবারে লুকাইয়া অর্থসাহায্য করে। এটি তাহার নিজের খরচ। স্বামীর নিকট হইতে প্রতি মাসে যাহা পায়, সমস্তই ইহাতে ব্যয় করে। কিন্তু যেমন করিয়া যাহাই ব্যয় হউক, সদর-কাছারির নায়েব-গোমস্তার তাহা জানিতে বাকী থাকে না। নিজেদের মধ্যে তাহারা বলাবলি করিতে থাকে। দাসীরা লুকাইয়া শুনিয়া আসে যে, সংসারে ব্যয় আজকাল ডবলের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে; তহবিল শূন্য—কিছুই জমা হইতেছে না। সংসারে বাজে-খরচ বৃদ্ধি পাইলে দাসদাসীর যেন তাহা মর্মান্তিক হয়। তাহাদের কাছে জলদ এ-সব কথা শুনিতে পায়। একদিন রাত্রে সে স্বামীকে কহিল, তুমি কি এ বাড়ির কেউ নয়?

মহেন্দ্র বলিল, কেন বল দেখি?

স্ত্রী কহিল, দাসদাসীরা দেখতে পায়, আর তুমি পাও না? কর্তার নতুনগিন্নী-অন্ত প্রাণ, তিনি তো আর কিছু বলবেন না; কিন্তু তোমার বলা উচিত।

মহেন্দ্র কথাটা বুঝিল না, কিন্তু উৎসুক হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, কিসের কথা?

জলদবালা গম্ভীর হইয়া স্বামীকে মন্ত্রণা দিতে লাগিল—নতুন মার ছেলেমেয়ে নাই, তাঁর কেন সংসারে টান হবে, সব উড়িয়ে দিলেন, দেখতেও পাও না?

মহেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কি করে!

জলদ কহিল, তোমার চোখ থাকলে দেখতে পেতে। আজকাল সংসারের দ্বিগুণ খরচ—সদা ব্রত, দান-খয়রাত, অতিথি-ফকির। আচ্ছা, তিনি যেন পরকালের কাজ করচেন; কিন্তু তোমারও তো ছেলেমেয়ে হবে? তখন তারা খাবে কি? নিজের জিনিস বিলিয়ে দিয়ে কি শেষে ভিক্ষে করবে নাকি?

মহেন্দ্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, তুমি কার কথা বলচ, মার কথা?

জলদ কহিল, আমার পোড়া কপাল যে, এ-সব আবার মুখ ফুটে বলতে হয়।

মহেন্দ্র কহিল, তাই তুমি মার নামে নালিশ করতে এসেচ?

জলদ রাগ করিয়া বলিল, আমার নালিশ-মকদ্দমার দরকার নেই। শুধু ভেতরের খবরটা জানিয়ে দিলুম, নইলে শেষে আমাকেই দোষ দিতে।

মহেন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার বাপের বাড়িতে রোজ হাঁড়ি চড়ে না, তুমি জমিদারের বাড়ির খরচের ব্যাপার কি বোঝ?

এবার জলদও রাগিয়া উঠিল; বলিল, তোমার মার বাপের বাড়িতেই-বা ক'টা অতিথিশালা আছে শুনি?

মহেন্দ্র আর তর্কাতর্কি না করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সকালে উঠিয়া পার্বতীর কাছে আসিয়া কহিল, কি বিয়ে দিলে মা, একে নিয়ে সংসার করাই যে যায় না। আমি কলকাতায় চললুম।

পার্বতী অবাক হইয়া কহিল, কেন বাবা?

তোমাদের নামে কটু কথা বলে—আমি ওকে ত্যাগ করলুম।

পার্বতী কিছুদিন হইতেই বড়বৌয়ের আচরণ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, সে যে আমার বড় ভাল মেয়ে! তার পর সে জলদকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, বৌমা, ঝগড়া হয়েচে বুঝি?

সকাল হইতেই জলদ স্বামীর কলিকাতা-যাত্রার আয়োজন দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইয়াছিল; শাশুড়ীর কথায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমারই দোষ মা। কিন্তু ঐ দাসীরাই খরচপত্রের কথা নিয়ে বলাবলি করে।

পার্বতী তখন সমস্ত শুনিল। নিজে লজ্জিত হইয়া বধূর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, বৌমা, তুমি ঠিক বলেচ। কিন্তু আমি মা তেমন সংসারী নই, তাই খরচের দিকটা আমার স্মরণ ছিল না।

তাহার পর মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, বিনাদোষে রাগ করো না—তুমি স্বামী, তোমার মঙ্গল-চিন্তার কাছে স্ত্রীর আর সব তুচ্ছ হওয়া উচিত। বৌমা তোমার লক্ষ্মী।

কিন্তু সেইদিন হইতে পার্বতী হাত গুটাইয়া আনিল। অতিথিশালার, ঠাকুরবাড়ির আর তেমন সেবা হইল না; অনাথ, অন্ধ, ফকির অনেকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কর্তা শুনিয়া পার্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, কনেবৌ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কি ফুরাল নাকি?

পার্বতী সহাস্যে উত্তর দিল, শুধু দিলেই চলবে কেন? দিনকতক জমা করাও তো চাই—দেখচ না, খরচ কত বেড়ে গেছে!

তা যাক। আমার আর ক'দিন! দিনকতক সৎকর্ম করে পরকালের দিকটা দেখা উচিত।

পার্বতী হাসিয়া কহিল, এ যে বড় স্বার্থপরের মতো কথা গো! নিজেরটাই দেখবে, আর ছেলেমেয়েরা কি ভেসে যাবে? দিনকতক আবার চুপ করে থাকো, তার পর আবার সব হবে। কাজ মানুষের তো আর ফুরিয়ে যায় না!

কাজেই চৌধুরী মহাশয় নিরস্ত হইলেন।

পার্বতীর এখন কাজ কমিয়াছে, তাই ভাবনাটা কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সমস্ত ভাবনারই একটা ধরন আছে। যাহার আশা আছে, সে একরকম করিয়া ভাবে; আর যাহার আশা নাই, সে অন্যরকম ভাবে। পূর্বোক্ত ভাবনার মধ্যে সজীবতা আছে, সুখ আছে, তৃপ্তি আছে, দুঃখ আছে, উৎকণ্ঠা আছে; তাই মানুষকে শ্রান্ত করিয়া আনে—বেশীক্ষণ ভাবিতে পারে না। কিন্তু আশাহীনের সুখ নাই, দুঃখ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, অথচ তৃপ্তি আছে। চোখ দিয়া জলও পড়ে, গভীরতাও আছে—কিন্তু নিত্য নূতন করিয়া মর্মভেদ করে না। হালকা মেঘের মতো যথা-তথা ভাসিয়া চলে। যেখানে বাতাস লাগে না, সেখানে দাঁড়ায়; আর যেখানে লাগে, সেখান হইতে সরিয়া যায়; তন্ময় মন উদ্বেগহীন চিন্তায় একটা সার্থকতা লাভ করে। পার্বতীর আজকাল ঠিক তাই হইয়াছে। পূজা-আহ্নিক করিতে বসিয়া অস্থির, উদ্দেশ্যহীন হতাশ মনটা চট্‌করিয়া একবার তালসোনাপুরের বাঁশঝাড়, আমবাগান, পাঠশালা-ঘর, বাঁধের পাড় প্রভৃতি ঘুরিয়া আসে। আবার হয়ত এমন কোন স্থানে লুকাইয়া পড়ে যে, পার্বতী নিজেকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। আগে হয়ত ঠোঁটের কোণে হাসি আসিয়াছিল, এখন হয়ত একফোঁটা চোখের জল টপ্‌করিয়া কোষার জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তবু দিন কাটে। কাজ করিয়া, মিষ্ট কথাবার্তা কহিয়া, পরোপকার, সেবা-শুশ্রূষা করিয়াও কাটে, আবার সব ভুলিয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতো কাটে। কেহ কহে লক্ষ্মীস্বরূপা অন্নপূর্ণা! কেহ কহে অন্যমনস্কা উদাসিনী! কিন্তু কাল সকাল হইতে তাহার অন্য একরকমের পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। যেন কিছু তীব্র, কিছু কঠোর। সেই পরিপূর্ণ থমথমে জোয়ার-গঙ্গায় যেন হঠাৎ কোথা হইতে ভাটার টান ধরিয়াছে। বাড়ির কেহ কারণ জানে না, শুধু আমরা জানি। মনোরমা কাল গ্রাম হইতে একখানা পত্র লিখিয়াছে। যাহা লিখিয়াছে, তাহা এইরূপ—

পার্বতী, অনেকদিন হইতে দু'জনের কেহ কাহাকেও পত্র লিখি নাই, সেজন্য দোষটা উভয়তঃ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা একটা মিটমাট হইয়া যায়। দু'জনেই দোষ স্বীকার করিয়া অভিমানটা কম করি। কিন্তু আমি বড়, তাই আমি মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম। ভরসা করি শীঘ্র উত্তর দিবে। আজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছি। আমরা গৃহস্থঘরের মেয়েরা শারীরিক ভালমন্দটা তেমন বুঝি না।

মরিলে বলি গঙ্গায় গিয়াছে; আর বাঁচিয়া থাকিলে বলি, ভাল আছে। আমিও তাই ভাল আছি। কিন্তু এ তো গেল নিজের কথা, বাজে কথা। কাজের কথাও এমন যে কিছু আছে, তাও নয়। তবে একটা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কাল হইতে ভাবিতেছি দিব কি না। দিলে তোমার ক্লেশ হইবে, না দিলেও আমি বাঁচি না—যেন মারীচের দশা হইয়াছে। দেবদাসের কথা শুনিয়া তোমার তো দুঃখ হইবেই, কিন্তু আমিও যে তোমার কথা মনে করিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে তুমি যে অভিমানিনী, তার হাতে পড়িলে এতদিন হয় জলে ডুবিতে, না হয় বিষ খাইতে। আর তার কথা আজ শুনিলেও শুনিবে, দু'দিন পরে হইলেও শুনিবে, কেননা, যে কথা সংসারসুদ্ধ লোকে জানে, তার আর চাপাচাপি কি?

আজ প্রায় ছয়-সাতদিন হইল সে এখানে আসিয়াছে। তুমি তো জান, জমিদারগৃহিণী কাশীবাসী হইয়াছেন, আর দেবদাস কলিকাতাবাসী হইয়াছে। বাড়ি আসিয়াছে শুধু দাদার সহিত কলহ করিতে, আর টাকা লইতে। শুনিলাম, এখন সে মধ্যে মধ্যে আসে; যতদিন টাকার যোগাড় না হয়, ততদিন থাকে,—টাকা পাইলেই চলিয়া যায়।

তাহার পিতা মরিয়াছেন আজ আড়াই বছর হইল। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, এইটুকু সময়ের মধ্যে সে নাকি তাহার অর্ধেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। দ্বিজদাস নাকি বড় হিসাবী লোক, তাই কোনমতে পৈতৃক সম্পত্তি নিজে রাখিয়াছে, না হইলে এতদিনে পাঁচজনে লুটিয়া লইত। মদ ও বেশ্যায় সর্বস্বান্ত হইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? এক পারে যম! আর তারও বোধ হয় বেশী দেরি নাই। সর্বরক্ষা—যে বিবাহ করেনি।

আহা, দুঃখও হয়। সে সোনার বর্ণ নাই, সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই—এ যেন আর কেহ! রুক্ষ চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, নাক যেন খাঁড়ার মতো উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। কি কুৎসিত যে হইয়াছে, তোমাকে আর তা কি বলিব! দেখিলে ঘৃণা হয়, ভয় করে। সমস্তদিন নদীর ধারে, বাঁধের পাড়ে বন্দুক হাতে পাখি মারিয়া বেড়ায়। আর রৌদ্রে মাথা ঘুরিয়া উঠিলে বাঁধের পাড়ে সেই কুলগাছটার তলায় মুখ নিচু করিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ি গিয়া মদ খায়—রাত্রে ঘুমায় কি ঘুরিয়া বেড়ায়, ভগবান জানেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নদীতে জল আনিতে গিয়াছিলাম; দেখি দেবদাস বন্দুক-হাতে ধীরে ধীরে শুষ্কমুখে চলিয়া যাইতেছে। আমাকে চিনিতে পারিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—আমি তো ভয়ে মরি! ঘাটে জনপ্রাণী নাই—আমি সেদিন আর আমাতে ছিলাম না। ঠাকুর রক্ষা করিয়াছেন যে, কোনরূপ মাতলামি কি বদমায়েশি করে নাই। নিরীহ ভদ্রলোকটির মতো শান্তভাবে বলিল, 'মনো, ভাল আছ তো দিদি?'

আমি আর করি কি, ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হুঁ'।

তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সুখে থাক বোন, তোদের দেখলে বড় আহ্লাদ হয়। তারপর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আমি উঠি তো পড়ি—প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইলাম। মা গো! ভাগ্যে হাত-টাত কিছু ধরিয়া ফেলে নাই! যাক তার কথা—সে-সব দুর্বৃত্তের কথা লিখিতে গেলে চিঠিতে কুলায় না।

বড় কষ্ট দিলাম কি বোন? আজিও তাহাকে যদি না ভুলিয়া থাক তো কষ্ট হইবেই। কিন্তু উপায় কি? আর, সেজন্য রাঙ্গা পায়ে যদি অপরাধ হইয়া থাকে তা নিজ গুণে তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী মনোদিদিকে ক্ষমা করিও।

কাল পত্র আসিয়াছিল। আজ সে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, দুটো পালকি আর বত্রিশ জন কাহার চাই, আমি এখনি তালসোনাপুরে যাব।

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, পালকি বেহারা আনিয়ে দিচ্চি, কিন্তু দুটো কেন মা?

পার্বতী কহিল, তুমি সঙ্গে যাবে বাবা। পথে যদি মরি, মুখে আগুন দেবার জন্য বড়ছেলেকে প্রয়োজন।

মহেন্দ্র আর কিছু কহিল না। পালকি আসিলে দুইজনে প্রস্থান করিল।

চৌধুরী মহাশয় শুনিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া দাসদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কিন্তু কারণ বলিতে পারিল না। তখন তিনি বুদ্ধি খরচ করিয়া আরও পাঁচ-ছ'জন দরোয়ান, দাসদাসী পাঠাইয়া দিলেন।

একজন সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল, পথে দেখা হলে পালকি ফিরিয়ে আনতে হবে কি?

তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, না, তাতে কাজ নেই। তোমরা সঙ্গে যেয়ো—যেন কোন বিপদ-আপদ ঘটে না।

সেইদিন সন্ধ্যার পর পালকি দুইটা তালসোনাপুরে পৌঁছিল, কিন্তু দেবদাস গ্রামে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

পার্বতী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, অদৃষ্ট! মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

মনো বলিল, পারু কি দেবদাসকে দেখতে এসেছিলে?

পার্বতী বলিল, না, সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম। এখানে তার আপনার লোক তো কেউ নেই।

মনোরমা অবাক হইল। কহিল, বলিস কি? লজ্জা করত না?

লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব—তাতে লজ্জা কি?

ছিঃ ছিঃ—ওকি কথা! একটা সম্পর্ক পর্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে এনো না।

পার্বতী ম্লানহাসি হাসিয়া কহিল, মনোদিদি, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে

বাসা করে আছে, এক-আধবার তা মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন তাই এ কথা শুনলে।

পরদিন প্রাতঃকালে পার্বতী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় পালকিতে উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আজ দুই বৎসর হইতে অশথঝুরি গ্রামে চন্দ্রমুখী ঘর বাঁধিয়াছে। ছোট নদীর তীরে একটা উঁচু জায়গায় তাহার ঝরঝরে দু'খানি মাটির ঘর; পাশে একটা চালা, তাহাতে কালো রংয়ের একটা পরিপুষ্ট গাভী বাঁধা থাকে। ঘর-দুইটির একটিতে রান্না, ভাঁড়ার; অপরটিতে সে শোয়। উঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রমা বাগদীর মেয়ে রোজ নিকাইয়া দিয়া যায়। চতুর্দিকে ভেরেণ্ডার বেড়া, মাঝখানে একটা কুলগাছ, আর একপাশে তুলসীর ঝাড়। সম্মুখে নদীর ঘাট—লোক লাগাইয়া, খেজুর গাছ কাটিয়া সিঁড়ি তৈয়ারি করিয়া লইয়াছে। সে ভিন্ন এ ঘাট আর কেহ ব্যবহার করে না। বর্ষার সময় দু'কূল পুরিয়া চন্দ্রমুখীর বাটীর নীচে পর্যন্ত জল আসে। গ্রামের লোক ব্যগ্র হইয়া কোদাল লইয়া ছুটিয়া আসে। নীচে মাটি ফেলিয়া উঁচু করিয়া দিয়া যায়। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই। চাষা, গোয়ালা, বাগদী দু'ঘর কলু, আর গ্রামের শেষে ঘর-দুই মুচীর বাস। চন্দ্রমুখী এ গ্রামে আসিয়া দেবদাসকে সংবাদ দেয়; উত্তরে সে আরও কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয়। এই টাকা চন্দ্রমুখী গ্রামের লোককে ধার দেয়। আপদে-বিপদে সবাই তাহার কাছে ছুটিয়া আসে—টাকা লইয়া বাড়ি যায়। চন্দ্রমুখী সুদ লয় না—তাহার পরিবর্তে কলাটা, মূলাটা, ক্ষেতে শাক-সবজি তাহারা ইচ্ছা করিয়া দিয়া যায়; আসলের জন্যও কখনো পীড়াপীড়ি করে না। যে দিতে পারে না, সে দেয় না।

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলে, আর তোকে কখনও দেব না।

সে নম্রভাবে বলে, মা ঠাকরুন, আশীর্বাদ কর, এবার যেন ভাল ফসল হয়।

চন্দ্রমুখী আশীর্বাদ করে। আবার হয়ত ভাল ফসল হয় না, খাজনার তাগাদা পড়ে—

আবার আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়—চন্দ্রমুখী আবার দেয়। মনে মনে হাসিয়া বলে, তিনি বাঁচিয়া থাকুন, আমার টাকার ভাবনা কি!

কিন্তু তিনি কোথায়? প্রায় ছয় মাস হইল, সে কোন সংবাদ পায় নাই। চিঠি লিখিলে জবাব আসে না, রেজেস্ট্রি করিয়া দিলে ফিরিয়া আসে। একঘর গয়লাকে চন্দ্রমুখী নিজের বাটীর কাছে বসাইয়াছে, তাহার পুত্রের বিবাহে সাড়ে দশ গণ্ডা টাকা পণ দিয়াছে, একজোড়া লাঙ্গল কিনিয়া দিয়াছে। তাহারা সপরিবারে চন্দ্রমুখীর আশ্রিত এবং নিতান্ত অনুগত। একদিন সকালবেলা চন্দ্রমুখী ভৈরব গয়লাকে ডাকিয়া কহিল, ভৈরব, তালসোনাপুর এখান থেকে কতদূর জানো?

ভৈরব চিন্তা করিয়া কহিল, দুটো মাঠ পার হলেই কাছারি।

চন্দ্রমুখী প্রশ্ন করিল, সেখানে বুঝি জমিদার থাকেন?

ভৈরব কহিল, হাঁ তিনি মুলুকের জমিদার। এ গাঁও তাঁর। আজ তিন বছর হল তিনি স্বর্গে গিয়েছেন; যত প্রজা একমাস ধরে সেখানে নুচিমণ্ডা খেয়েছিল। এখন তাঁর দুই ছেলে আছে, মস্ত বড়লোক—রাজা।

চন্দ্রমুখী কহিল, ভৈরব, আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার?

ভৈরব বলিল, কেন পারব না মা, যেদিন ইচ্ছা চল।

চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া বলিল, তবে চল না কেন ভৈরব, আমরা আজই যাই।

ভৈরব বিস্মিত হইয়া কহিল, আজই? তারপর চন্দ্রমুখীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, তা হলে মা তুমি শিগগির রান্না করে নাও, আমিও দুটো মুড়ি বেঁধে নিই।

চন্দ্রমুখী বলিল, আমি আর রান্না করব না ভৈরব, তুমি মুড়ি বেঁধে নাও।

ভৈরব বাড়ি গিয়া কিছু মুড়ি ও গুড় চাদরে বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিল। একগাছা লাঠি হাতে লইয়া ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তবে চল; কিন্তু তুমি কিছু খাবে না মা?

চন্দ্রমুখী বলিল, না ভৈরব, আমার এখনো পূজা-আহ্নিক হয়নি; যদি সময় পাই তো সেখানে গিয়ে ও-সব করব।

ভৈরব আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। পিছনে চন্দ্রমুখী বহু কষ্টে আলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অনভ্যস্ত কোমল পা-দুটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইল, রৌদ্রে সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্নানাহার কিছুই হয় নাই; তবু চন্দ্রমুখী মাঠের পর মাঠ পার হইয়া চলিতে লাগিল। মাঠের কৃষকেরা আশ্চর্য হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রমুখীর পরিধানে একখানা লালপেড়ে কাপড়, হাতে দু'গাছা বালা, মাথায় কপালের উপর পর্যন্ত আধ-ঘোমটা; সমস্ত দেহ একখানা মোটা বিছানার চাদরে

আবৃত। সূর্যদেবের অস্ত যাইতে যখন আর অধিক বিলম্ব নাই, সেই সময়ে দুইজনে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রমুখী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ভৈরব তোমার দুটো মাঠ এতক্ষণে কি শেষ হল?

ভৈরব পরিহাসটা বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে বলিল, মা ঠাকরুন, এইবার এসেচি; কিন্তু তোমাদের এই সুখী শরীরে আজ কি আর ফিরে যেতে পারবে?

চন্দ্রমুখী মনে মনে বলিল, আজ কেন, কাল বোধ করি এ পথ হাঁটতে পারব না।

প্রকাশ্যে কহিল, ভৈরব, গাড়ি পাওয়া যায় না?

ভৈরব বলিল, যায় বৈ কি মা, গরুর গাড়ি ঠিক করব?

গাড়ি ঠিক করিতে আদেশ করিয়া চন্দ্রমুখী জমিদার-বাটী প্রবেশ করিল।

ভৈরব গাড়ির বন্দোবস্তে অন্যদিকে গেল। অন্দরে উপরের বারান্দায় বড়বৌ (আজকাল জমিদারগৃহিণী) বসিয়া ছিলেন। একজন দাসী সেইখানে চন্দ্রমুখীকে লইয়া উপস্থিত করিল। উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিল।

চন্দ্রমুখী নমস্কার করিল। বড়বধূর দেহে অলঙ্কার ধরে না, চোখের কোণ দিয়া অহঙ্কার ফাটিয়া পড়িতেছে। ঠোঁট দুটা ও দাঁতগুলা পান ও মিসিতে প্রায় কালো হইয়া গিয়াছে। একদিকের গাল উঁচু, বোধ হয় দোক্তা আর পানে ভরা আছে। এমন টান করিয়া চুল বাঁধা যে খোঁপাটা মাথার ডগায় উঠিয়াছে। দু'কানে ছোট-বড় বিশ-ত্রিশটা মাকড়ি। নাকের একদিকে নাকচাবি, অপর দিকে মস্ত ফুটা—বোধ হয়

শাশুড়ির আমলে তাহাতে নথ পরা হইত।

চন্দ্রমুখী দেখিল, বড়বৌয়ের বেশ মোটাসোটা মাজা-ঘষা দেহ, বর্ণ বেশ শ্যাম, বেশ ভাসা চোখ, গোল ধরনের মুখ—পরনে কালাপেড়ে শাড়ি, গায়ে একটা দামী জামা—সেইটা দেখিয়া চন্দ্রমুখীর ঘৃণা বোধ হইল৷ আর বড়বৌ দেখিলেন, চন্দ্রমুখীর বয়স হইলেও শরীরে রূপ ধরে না৷ দু'জনেই বোধ করি সমবয়সী, কিন্তু বড়বৌ মনে মনে তাহা স্বীকার করিলেন না৷ এ গ্রামে পার্বতী ভিন্ন অতখানি রূপ তিনি আর কাহারও দেখেন নাই৷ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে গা?

চন্দ্রমুখী কহিল, আমি আপনারই একজন প্রজা; কিছু খাজনা বাকি পড়েচে তাই দিতে এসেচি৷

বড়বৌ মনে মনে খুশি হইয়া বলিলেন, তা এখানে কেন? কাছারি-বাড়ি যাও না৷

চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া কহিল, মা, আমরা দুঃখী মানুষ, সব খাজনা তো দিতে পারিনে৷ শুনেচি, আপনার বড় দয়া; তাই আপনার কাছেই এসেচি, দয়া করে কিছু মাপ করে দেন৷

এরূপ কথা বড়বৌ জীবনে এই প্রথম শুনিলেন৷ তাঁর দয়া আছে, খাজনা মাপ করিতে পারেন—কাজেই চন্দ্রমুখী একেবারে প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িল৷ বড়বৌ কহিলেন, তা বাছা, দিনের মধ্যে এমন কত টাকা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়, কত লোক আমাকে ধরে; আমি না বলিতে পারি না, এজন্য কর্তা আমার উপর কত রাগ করেন৷—তা তোমার কত টাকা বাকি পড়েচে?

বেশি নয় মা, মোটে দু'টাকা; কিন্তু আমাদের কাছে তাই যেন পাহাড়; সমস্ত দিন আজ পথ চলে এসেচি।

বড়বৌ কহিলেন, আহা, তোমরা দুঃখী লোক, আমাদের দয়া করাই উচিত। ও বিন্দু একে বাইরে নিয়ে যা, দেওয়ানমশাইকে আমার নাম করে বলে দে, যেন দু'টাকা মাপ করা হয়। তা বাছা, তোমার বাড়ি কোথায়?

চন্দ্রমুখী বলিল, আপনারই রাজত্বে—ওই অশথঝুরি গাঁয়ে। আচ্ছা মা, কর্তারা এখন দু'শরিক, না?

বড়বৌ বলিলেন, পোড়া কপাল ! ছোট শরিক আর কি আছে? দু'দিন পরে আমারই সব হবে।

চন্দ্রমুখী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা? ছোটবাবুর বুঝি ধার-কর্জ?

বড়বৌ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার কাছে সব বাঁধা। ঠাকুরপো একেবারে বয়ে গেছে! কলকাতায় মদ-বেশ্যা এই নিয়েই আছে। কত টাকা উড়িয়ে দিলে তার কি আদি-অন্ত আছে!

চন্দ্রমুখীর মুখ শুকাইল, একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ মা, ছোটবাবু কি তা হলে বাড়িও আসেন না?

বড়বৌ বলিলেন, আসবে না কেন ! যখন টাকার দরকার হয়, আসে। ধার করে,

বিষয় দেয়—চলে যায়। এই মাস-দুই হল এসে বারো হাজার টাকা নিয়ে গেছে। বাঁচবার আকারও নেই, গা-ময় কুচ্ছিত রোগ জন্মেচে—ছিঃ—ছিঃ—

চন্দ্রমুখী শিহরিয়া উঠিল—মলিন-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কলকাতায় কোথায় থাকেন?

বড়বৌ কপালে একটা করাঘাত করিয়া হাসিমুখে কহিলেন, পোড়া দশা! তা কেউ কি জানে? কোথায় কোন্‌হোটেলে খায়—যার-তার বাড়িতে পড়ে থাক—সেই জানে,—আর যম জানে।

চন্দ্রমুখী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি—যাই—

বড়বৌ একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, যাবে? ওরে ও বিন্দু—

চন্দ্রমুখী বাধা দিয়া বলিল, থাক্‌মা, আমি আপনিই কাছারিতে যেতে পারব, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাটীর বাহির হইয়া দেখিল, ভৈরব অপেক্ষা করিয়া আছে—গো-শকট প্রস্তুত। সেই রাত্রে চন্দ্রমুখী বাটী ফিরিয়া আসিল। সকালবেলা ভৈরবকে আবার ডাকিয়া কহিল, ভৈরব, আমি আজ কলকাতায় যাব; তুমি তো যেতে পারবে না, তাই তোমার ছেলেকে সঙ্গে নেব, কি বল?

তোমার ইচ্ছে। কিন্তু কলকাতায় কেন মা, বিশেষ কোন কাজ আছে কি?

হাঁ ভৈরব, বিশেষ কাজ আছে।

আবার কবে আসবে মা?

সে কথা বলতে পারিনে ভৈরব। হয়ত শীঘ্র ফিরে আসব, হয়ত বা দেরি হবে। আর যদি না আসি, এ-সব ঘরবাড়ি তোমার রইল।

প্রথমে ভৈরব অবাক হইয়া গেল। তাহার পর তাহার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। কহিল, ও কি কথা মা! তুমি না এলে এ গাঁয়ের লোক যে কেউ বাঁচবে না।

চন্দ্রমুখী সজলচক্ষে মৃদু হাসিয়া বলিল, সেকি ভৈরব, আমি দু'বছর হল এখানে এসেচি। তার পূর্বে কি তোমরা বেঁচে ছিলে না?

ইহার উত্তর মূর্খ ভৈরব দিতে পারিল না, কিন্তু চন্দ্রমুখী অন্তরে সমস্তই বুঝিল। ভৈরবের ছেলে কেব্‌লা শুধু সঙ্গে যাইবে। গাড়িতে আবশ্যক দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া উঠিবার সময় পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখিতে আসিল, দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। চন্দ্রমুখীর নিজের চোখেও জল ধরে না। ছাই কলিকাতা! দেবদাসের জন্য না হইলে কলিকাতার রানীগিরি পাইবার জন্যও চন্দ্রমুখী এত ভালবাসা তুচ্ছ করিয়া যাইতে পারিত না।

পরদিন সে ক্ষেত্রমণির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পূর্বের বাসাতে এখন অন্য লোক আসিয়াছে। ক্ষেত্রমণি অবাক হইয়া গেল—দিদি যে! কোথায় ছিলে এতদিন?

চন্দ্রমুখী সত্য কথা গোপন করিয়া বলিল, এলাহাবাদে ছিলাম।

ক্ষেত্রমণি ভাল করিয়া নজর দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, তোমার গহনাগাঁটি কি হল দিদি?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, সব আছে।

সেই দিন মুদীর সহিত দেখা করিয়া কহিল, দয়াল, কত টাকা আমি পাব?

দয়াল বিপদে পড়িল—তা বাছা, প্রায় ষাট-সত্তর টাকা। আজ না হোক দু'দিন পরে দিব।

তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। যদি আমার কিছু কাজ করে দাও।

কি কাজ?

দু'দিন খাটতে হবে এই মাত্র। আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া করবে—বুঝলে?

দয়াল হাসিয়া বলিল, বুঝেছি বাছা।

ভাল বাড়ি। বেশ ভাল বিছানা, বালিশ, চাদর, আলো, ছবি, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল—বুঝলে?

দয়াল মাথা নাড়িল।

আরশি, চিরুনি, রং-করা দু'জোড়া কাপড়, গায়ের জামা, আর—ভাল গিল্টির গয়না কোথায় পাওয়া যায় জান?

দয়াল মুদী ঠিকানা বলিয়া দিল।

চন্দ্রমুখী কহিল, তবে তাও এক সেট ভাল দেখে কিনতে হবে—আমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করে নেব। তারপর হাসিয়া কহিল, আমাদের যা চাই, জানো তো সব,—একজন ঝিও ঠিক করতে হবে।

দয়াল কহিল, কবে চাই বাছা?

যত শীঘ্র হয়। দু'তিন দিনের মধ্যে হলেই ভাল হয়। বলিয়া চন্দ্রমুখী তাহার হাতে একশত টাকার নোট দিয়া কহিল,—ভালো জিনিস নিয়ো, সস্তা করো না।

তৃতীয় দিবসে সে নূতন বাটীতে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলরামকে লইয়া মনের মতো করিয়া ঘর সাজাইল এবং সন্ধ্যার পূর্বে আপনি সাজিতে বসিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া তাহাতে পাউডার দিল, আলতা গুলিয়া পায়ে দিল, পান খাইয়া ওষ্ঠ রঞ্জিত করিল। তাহার পর সর্বাঙ্গে গহনা পরিয়া জামা আঁটিয়া রং-করা কাপড় পরিল; বহুদিন পরে চুল বাঁধিয়া আবার টিপ পরিল। আয়নায় মুখ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, পোড়া অদৃষ্টে আরও কি আছে!

পাড়াগাঁয়ের ছেলে কেবলরাম সহসা এই অভিনব সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল, দিদি, এ কি!

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, কেবল, আজ আমার বর আসবে।

কেবলরাম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রমণি বেড়াইতে আসিল,—দিদি, এ আবার কি?

চন্দ্রমুখী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, এ-সব চাই তো আবার।

ক্ষেত্রমণি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিদির যত বয়স বাড়চে, রূপও তত বাড়চে।

সে চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী বহুদিন পূর্বের মতো আবার জানলার পার্শ্বে উপবেশন

করিল। নির্নিমেষচক্ষে রাস্তার পানে চাহিয়া রহিল। এই তাহার কাজ; এই করিতে সে আসিয়াছে—যতদিন এখানে থাকিবে, ততদিন ইহাই করিবে। নূতন লোক কেহ হয়ত আসিতে চায়, দ্বার ঠেলাঠেলি করে; কেবলরাম মুখস্থর মতো ভিতর হইতে কহে—এখানে নয়।

পুরাতন পরিচিত কেহ বা আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রমুখী বসাইয়া হাসিয়া কথা কহে; কথায় কথায় দেবদাসের কথা জিজ্ঞাসা করে; তাহারা বলিতে পারে না—অমনি

বিদায় করিয়া দেয়। রাত্রি অধিক হইলে নিজে বাহির হইয়া পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। অলক্ষ্যে দ্বারে দ্বারে কান পাতিয়া কথাবার্তা শুনিতে চায়—নানা লোকে নানা কথা বলে, যাহা শুনিতে চায়, তাহা কিন্তু শোনা যায় না—কেহ বা মুখ ঢাকিয়া হঠাৎ মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়—স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়ায়—শশব্যস্তে চন্দ্রমুখী সরিয়া যায়। দুপুরবেলা পুরাতন পরিচিত সঙ্গিনীদের বাড়ি বেড়াইতে যায়। কথায় কথায় প্রশ্ন করে,—কেহ দেবদাসকে জান?

তাহারা জিজ্ঞাসা করে, কে দেবদাস?

চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া পরিচয় দিতে থাকে—গৌরবর্ণ, মাথায় কোঁকড়া চুল, কপালের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ, বড়লোক—অজস্র টাকা খরচ করে, কেউ চেন কি?

কেহই সন্ধান দিতে পারে না। হতাশ বিষণ্নমুখে চন্দ্রমুখী বাড়ি ফিরিয়া যায়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া থাকে। ঘুম পাইলে বিরক্ত হয়; মনে মনে কহে, এ কি তোমার ঘুমাইবার সময়?

ক্রমে একমাস অতীত হইল, কেবলরামও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রমুখীর নিজেরও সন্দেহ হইতে লাগিল, বুঝি সে এখানে নাই। তবুও আশায় ভর করিয়া দেবতার চরণে কায়মনে প্রার্থনা করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

কলিকাতা আসিবার পর দেড়মাস গত হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। রাত্রি তখন এগারোটা—হতাশমনে বাড়ি ফিরিতেছিল, দেখিতে পাইল, পথের ধারে একটা ঘরের সম্মুখে একজন আপনার মনে কি বলিতেছে। চন্দ্রমুখীর

বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। এ কণ্ঠস্বর যে পরিচিত! কোটি-কোটি লোকের মধ্যেও চন্দ্রমুখী সে স্বর বুঝিতে পারিত। স্থানটা একটু অন্ধকার, তাহাতে আবার লোকটা অত্যন্ত মাতাল হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। চন্দ্রমুখী নিকটে গিয়া গায়ে হাত দিল—তুমি কে গা, এমন করে পড়ে আছ?

লোকটা সুর করিয়া বলিল,—শুন সই, মনের মানুষ কই; যদি পাই কানু হেন স্বামী—

চন্দ্রমুখীর আর সন্দেহ নাই, ডাকিল, দেবদাস?

দেবদাস সেইভাবে বলিল, উঁ।

এখানে পড়ে কেন, ঘরে যাবে?

না, বেশ আছি—

একটু মদ খাবে?

'খাব' বলিয়া সে একেবারে চন্দ্রমুখীর গলা জড়াইয়া ধরিল, কহিল—এমন বন্ধু কে বাবা তুমি?

চন্দ্রমুখীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন বহু পরিশ্রমে টলিয়া টলিয়া, তাহার

গলা ধরিয়া কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাঃ, এ যে খাসা জিনিস!

চন্দ্রমুখীর কান্নায় হাসি মিশিল; কহিল, হাঁ, বেশ জিনিস; এখন আপাততঃ আমার কাঁধে ভর দিয়ে একটু এগিয়ে চল, একটা গাড়ি চাই তো।

তা চাই বৈ কি! পথে আসিতে আসিতে দেবদাস জড়িতকণ্ঠে কহিল, সুন্দরী, আমাকে তুমি চেন?

চন্দ্রমুখী কহিল, চিনি।

দেবদাস গাহিয়া উঠিল,—অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি—তাহার পর গাড়িতে বসিয়া চন্দ্রমুখীর কাঁধে ভর দিয়া বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পকেটে হাত দিয়া কহিল, সুন্দরী! কুড়িয়ে তো আনলে, কিন্তু পকেটে যে কিছু নেই—

চন্দ্রমুখী নীরবে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একেবারে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কহিল, ঘুমোও।

দেবদাস তেমনি জড়িতকণ্ঠে কহিল, কিছু মতলব আছে নাকি? এই যে বললাম পকেট খালি,—কিছু আশা নেই। বুঝলে রূপসী!

রূপসী তাহা বুঝিয়াছিল; কহিল, কাল দিয়ো।

দেবদাস বলিল, এতটা বিশ্বাস তো ভাল নয়—কি চাও খুলে বল দেখি?

চন্দ্রমুখী কহিল, কাল শুনো—বলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

দেবদাসের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা হইয়াছিল। ঘরে কেহ ছিল না।

চন্দ্রমুখী স্নান করিয়া নীচে রান্নার উদ্যোগে গিয়াছে। দেবদাস চাহিয়া দেখিল, এ ঘরে কখন সে আসে নাই, একটি জিনিসও চিনিতে পারিল না। তাহার গত রাত্রের কোন কথাই মনে পড়িল না; শুধু স্মরণ হইল কাহার একটা আন্তরিক সেবা। কে যেন বড় স্নেহ করিয়া টানিয়া আনিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সময়ে চন্দ্রমুখী ঘরে প্রবেশ করিল। রাত্রের সাজসজ্জার সে অনেকখানি পরিবর্তন করিয়াছিল। গায়ে গহনাগুলি ছিল বটে, কিন্তু পরনে রঙ্গিন কাপড়, কপালে টিপ, মুখে পানের দাগ—এ-সকল ছিল না। নিতান্তই একখানি সাদাসিধা কাপড় পরিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেবদাস মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল, কোথা থেকে কাল আমাকে ডাকাতি করে আনলে?

চন্দ্রমুখী বলিল, ডাকাতি করিনি—পথ থেকে শুধু কুড়িয়ে নেছিলাম।

দেবদাস হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, তা যেন হল, কিন্তু তোমার আবার এ-সব কি! কবে এলে? গায়ে যে গয়না ধরে না—দিলে কে?

চন্দ্রমুখী দেবদাসের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আবার!

দেবদাস হাসিয়া কহিল, না না—তা নয়; একটা তামাশা করতেও কি দোষ? এলে

কবে? চন্দ্রমুখী বলিল, দেড়-মাস হল।

দেবদাস মনে মনে যেন কি হিসাব করিল। পরে কহিল, আমাদের বাড়ি যখন গিয়েছিলে, তার পরেই এসেচ?

চন্দ্রমুখী বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম—কি করে জানলে?

দেবদাস কহিল, তুমি যাবার পরেই আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। একজন দাসী—যে তোমাকে বৌঠাকরুনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তার কাছেই শুনতে পাই,— কাল অশথঝুরি গাঁ থেকে একজন স্ত্রীলোক এসেছিল, সে ভারী সুন্দরী। আর কি বুঝতে বাকি থাকে! কিন্তু এত গয়না আবার গড়ালে কেন?

চন্দ্রমুখী বলিল, গড়াই নি, এ-সব গিল্টির গয়না, কলকাতায় এসে কিনেচি। তবুও দেখ দেখি, তোমার জন্য আমার কত বাজে খরচ করতে হল! অথচ কাল আমাকে তুমি চিনতেও পারলে না।

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; বলিল, একেবারে চিনতে পারিনি, কিন্তু যত্নটি চিনেছিলাম। অনেকবার মনে হয়েছিল, আমার চন্দ্রমুখী ছাড়া এত যত্ন কার?

আনন্দে চন্দ্রমুখীর কাঁদিতে সাধ হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেবদাস, আমাকে আর তত ঘৃণা কর না—না?

দেবদাস জবাব দিল, না। বরং ভালবাসি।

দুপুরবেলা স্নান করিবার সময় চন্দ্রমুখী দেখিল, দেবদাসের পেটে একখণ্ড ফ্লানেল বাঁধা আছে। ভয় পাইয়া বলিল, ও কি, ফ্লানেল বেঁধেছ কেন?

দেবদাস বলিল, পেটে একটু ব্যথা বোধ করি—তুমি অমন করচ কেন?

চন্দ্রমুখী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, সর্বনাশ করনি তো? লিভারে ব্যথা হয়নি তো?

দেবদাস হাসিয়া কহিল, চন্দ্রমুখী, বোধ হয় তাই হয়েচে।

সেইদিন ডাক্তার আসিয়া বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ঠিক এই আশঙ্কাই করিয়া গেলেন, ঔষধ দিলেন, এবং জানাইলেন যে যথেষ্ট সাবধানে না থাকিলে বিষম অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অর্থ উভয়েই বুঝিল। বাসায় সংবাদ দিয়া ধর্ম্মদাসকে আনা হইল, চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনা হইল। দু'দিন অমনি গেল, কিন্তু তৃতীয় দিনে তাহার জ্বর দেখা দিল।

দেবদাস চন্দ্রমুখীকে ডাকিয়া কহিল, খুব সময়ে এসেছিলে, না হলে হয়ত আর দেখতেই পেতে না।

চোখ মুছিয়া চন্দ্রমুখী প্রাণপণে সেবা করিতে বসিল। যুক্ত—করে প্রার্থনা করিল,

ভগবান, অসময়ে এতখানি কাজে লাগিব, এ আশা স্বপ্নেও করি নাই, কিন্তু দেবদাসকে ভাল করিয়া দাও।

প্রায় মাসাধিক কাল দেবদাস শয্যায় পড়িয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল, অসুখ তেমন গুরুতর হইতে পারিল না।

এই সময়ে একদিন দেবদাস কহিল, চন্দ্রমুখী, তোমার নামটা মস্ত বড়, সর্বদা ডাকতে অসুবিধা হয়,— একটু ছোট করে নিতে চাই।

চন্দ্রমুখী বলিল, বেশ তো।

দেবদাস কহিল, তবে আজ থেকে তোমাকে বৌ বলে ডাকব।

চন্দ্রমুখী হাসিয়া উঠিল। কহিল, তা যেন ডাকলে কিন্তু একটা মানে থাকা তো চাই।

সব কথার কি মানে থাকে?

যদি সাধ হয়ে থাকে, তাই ডেকো, কিন্তু এ সাধ কেন, তাও বলবে না?

না; কখনো কারণ জিজ্ঞাসা করতেও পাবে না।

চন্দ্রমুখী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বেশ তাই হবে।

দেবদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা বৌ, তুমি আমার কে যে, এত প্রাণপণে আমার সেবা করচ?

চন্দ্রমুখী লজ্জাবনত বধূ নহে, অ-বাক্‌পটু বালিকাও নহে; মুখপানে স্থির শান্ত দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল, তুমি আমার সর্বস্ব—তা কি আজও বুঝতে পারনি!

দেবদাস দেয়ালের দিকে চাহিয়া ছিল। সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তা পেরেচি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাইনে। পার্বতীকে কত ভালবাসি, সে আমাকে কত ভালবাসে, কিন্তু তবু কি কষ্ট! অনেক দুঃখ পেয়ে ভেবেছিলাম, আর কখনো এ-সব ফাঁদে পা দেব না; ইচ্ছে করে দিইও নি। কিন্তু তুমি এমন কেন করলে? জোর করে আমাকে কেন বাঁধলে? বলিয়া আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, বৌ, তুমিও হয়ত পার্বতীর মতোই কষ্ট পাবে।

চন্দ্রমুখী মুখে অঞ্চল দিয়া শয্যার একপ্রান্তে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

দেবদাস পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমাদের দু'জনে কত অমিল, আবার কত মিল। একজন অভিমানী উদ্ধত, আর একজন কত শান্ত, কত সংযত। সে কিছুই সইতে পারে না, আর তোমার কত সহ্য! তার কত যশ, কত সুনাম, আর তোমার কত কলঙ্ক! সবাই তাকে কত ভালবাসে, আর কেউ তোমাকে ভালবাসে না। তবে আমি ভালবাসি, বাসি বৈ কি! বলিয়া মোটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল, পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা তোমার কি বিচার করবেন জানিনে; কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি আবার মিলন হয়, আমি কখনো তোমা হতে দূরে থাকতে পারব না।

চন্দ্রমুখী নীরবে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল; মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, ভগবান, কোনকালে, কোন জন্মে যদি এ পাপিষ্ঠার প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমাকে যেন এই পুরস্কার দিয়ো।

মাস-দুই অতিবাহিত হইয়াছে। দেবদাস আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু শরীর সারে নাই। বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যক। কাল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, সঙ্গে শুধু ধর্মদাস যাইবে।

চন্দ্রমুখী ধরিয়া বসিয়াছিল, তোমার একজন দাসীরও তো প্রয়োজন, আমাকে সঙ্গে যেতে দাও।

দেবদাস বলিল, ছিঃ, তা হয় না! আর যাই করি, এত বড় নির্লজ্জ হতে পারব না।

চন্দ্রমুখী একেবারে মৌন হইয়া গেল। সে অবুঝ নয়, তাই সহজেই বুঝিল। আর যাহাই হোক, এ জগতে তাহার সম্মান নাই। তাহার সংস্পর্শে দেবদাস সুখ পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু কখনো সম্মান পাইবে না। চোখ মুছিয়া কহিল, আবার কবে দেখা পাব?

দেবদাস কহিল, বলতে পারিনে, তবে বেঁচে থাকতে তোমাকে কোনোদিন ভুলব না, তোমাকে দেখবার তৃষ্ণা আমার কখনো মিটবে না।

প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী সরিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি বলিল, এই আমার যথেষ্ট। এর

বেশী আশা করিনে।

যাবার সময় দেবদাস আরও দু'হাজার টাকা চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়া কহিল, রেখে দাও। মানুষের শরীরে তো বিশ্বাস নেই; শেষে তুমি কি অকূলে ভাসবে!

চন্দ্রমুখী ইহাও বুঝিল, তাই হাত পাতিয়া অর্থ গ্রহণ করিল। চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একটি কথা আমাকে বলে যাও—

দেবদাস মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি?

চন্দ্রমুখী কহিল, বড়বৌঠাকরুন বলেছিলেন, তোমার শরীরে খারাপ রোগ জন্মেচে—এ কি সত্য?

প্রশ্ন শুনিয়া দেবদাস দুঃখিত হইল; কহিল, বড়বৌ সব পারেন; কিন্তু তা হলে তুমি জানতে না? আমার কোন্‌কথা তোমার জানা নেই? এ-বিষয়ে তুমি যে পার্বতীরও বেশী।

চন্দ্রমুখী আর একবার চোখ মুছিয়া কহিল, বাঁচলুম। কিন্তু তবুও খুব সাবধানে থেকো। তোমার শরীর একে মন্দ, তার ওপর দেখো, কোনদিন ভুল করে বসো না।

প্রত্যুত্তরে দেবদাস শুধু হাসিল, কথা কহিল না।

চন্দ্রমুখী কহিল, আর একটি ভিক্ষে—দেহ এতটুকু খারাপ হলেই আমাকে খবর

দেবে বল?

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—দেব বৈ কি বৌ!

আর একবার প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী কাঁদিয়া কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন যখন দেবদাস এলাহাবাদে বাস করিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন সে চন্দ্রমুখীকে চিঠি লিখিয়াছিল, বৌ, মনে করেছিলাম, আর কখনো ভালবাসব না। একে তো ভালবেসে শুধু হাতে ফিরে আসাটাই বড় যাতনা, তার পরে আবার নূতন করে ভালবাসতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রমুখী কি লিখিয়াছিল, তাহাতে আবশ্যক নাই; কিন্তু এই সময়টায় দেবদাসের কেবলই মনে হইত, সে একবার এলে হয় না!

পরক্ষণে সভয়ে ভাবিত—না না, কাজ নেই,—কোনদিন পার্বতী যদি জানতে পারে! এমনি করিয়া একবার পার্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয়রাজ্যে বাস করিতেছিল। কখনও বা দু'জনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিত—যেন উভয়ের কত ভাব!

মনের মাঝে দু'জনেই পাশাপাশি বিরাজ করিত। কোনদিন বা অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইত, তাহারা দু'জনেই যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই সময়টায় মনটা তাহার এমনি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িত যে, শুধু একটা নির্জীব অতৃপ্তিই তাহার মনের মধ্যে মিথ্যা প্রতিধ্বনির মতো ঘুরিয়া বেড়াইত। তার পরে দেবদাস লাহোরে চলিয়া গেল। এখানে চুনিলাল কাজ করিতেছিল, সন্ধান পাইয়া দেখা করিতে আসিল। বহুদিন পরে দেবদাস সুরা স্পর্শ করিল। চন্দ্রমুখীকে মনে পড়ে, সে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। মনে হয়, তার কত বুদ্ধি। সে কত শান্ত, ধীর; আর তার কত স্নেহ। পার্বতী এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শুধু নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মতো কখনো কখনো জ্বলিয়া

জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাহার সহিল না। মাঝে মাঝে অসুখ হয়, পেটের কাছে আবার যেন ব্যথা বোধ হয়। ধর্মদাস একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, দেব্‌তা, তোমার শরীর আবার খারাপ হচ্চে—আর কোথাও চল।

দেবদাস অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, চল যাই।

দেবদাস প্রায় বাসাতে মদ খায় না। চুনিলাল আসিলে কোনোদিন খায়, কোনোদিন বাহির হইয়া চলিয়া যায়। রাত্রিশেষে বাটী ফিরিয়া আসে, কোন রাত্রি বা একেবারেই আসে না। আজ দুইদিন হইতে হঠাৎ তাহার দেখা নাই। কাঁদিয়া ধর্মদাস অন্নজল স্পর্শ করিল না। তৃতীয় দিনে দেবদাস জ্বর লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল; শয্যা লইল, আর উঠিতে পারিল না। তিন—চারিজন ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল।

ধর্মদাস কহিল, দেব্‌তা, কাশীতে মাকে খবর দিই—

দেবদাস তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল, ছিঃ ছিঃ—মাকে কি এ মুখ দেখাতে পারি?

ধর্মদাস প্রতিবাদ করিল, রোগ-শোক সকলেরই আছে; কিন্তু তাই বলে কি এতবড় বিপদের দিনে মাকে লুকানো যায়? তোমার কোনো লজ্জা নাই, দেব্‌তা, কাশীতে চল।

দেবদাস মুখ ফিরাইয়া কহিল, না ধর্মদাস, এ সময়ে তাঁর কাছে যেতে পারব না।

ভাল হই, তার পরে।

ধর্মদাস একবার মনে করিল, চন্দ্রমুখীর উল্লেখ করে; কিন্তু নিজে তাহাকে এত ঘৃণা করিত যে, তাহার মুখ মনে পড়িবামাত্রই চুপ করিয়া রহিল।

দেবদাসের নিজেরও অনেকবার এ কথা মনে হইত; কিন্তু কোনো কথা বলিতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং কেহই আসিল না। তার পরে অনেক দিনে সে ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল। একদিন সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, চল ধর্মদাস, এইবার আর কোথাও যাই। বিপদের দিনে মাকে লুকানো যায়?

তোমার কোন লজ্জা নাই, দেব্‌তা, কাশীতে চল।

জিনিসপত্র বাঁধিয়া চুনিলালের নিকট বিদায় লইয়া, দেবদাস আবার এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল—শরীরটা অনেকটা ভাল। কিছুদিন থাকিবার পর একদিন দেবদাস কহিল, ধর্ম, কোনো নূতন জায়গায় গেলে হয় না? কখনো বোম্বাই দেখিনি, যাবে?

আগ্রহ দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্মদাস মত দিল। সময়টা জ্যৈষ্ঠ মাস, বোম্বাই শহর তেমন গরম নয়। এখানে আসিয়া দেবদাস অনেকটা সারিয়া উঠিল।

ধর্মদাস জিজ্ঞাসা করিল, এখন বাড়ি গেলে হয় না?

দেবদাস কহিল, না, বেশ আছি। আমি এখানেই আর কিছুদিন থাকব।

এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাসের সকালবেলা, একদিন দেবদাস ধর্মদাসের কাঁধে ভর দিয়া বোম্বাই হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে আসিয়া বসিল। ধর্মদাস কহিল, দেব্‌তা, আমি বলি, মায়ের কাছে যাওয়া ভাল।

দেবদাসের দু' চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—আজ কয়দিন হইতে মাকে তাহার কেবল মনে পড়িতেছিল। হাসপাতালে পড়িয়া যখন তখন এই কথাই ভাবিয়াছে,—এ সংসারে তাহার সবই আছে, অথচ কেহই নাই। তাহার মা আছেন, বড় ভাই আছেন, ভগিনীর অধিক পার্বতী আছে—চন্দ্রমুখীও আছে! তাহার সবাই আছে, কিন্তু সে আর কাহারও নাই। ধর্মদাসও কাঁদিতেছিল; কহিল, তা হলে দাদা, মায়ের কাছে যাওয়াই স্থির?

দেবদাস মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিল; বলিল, না ধর্মদাস, মাকে এ মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না,—আমার এখনো বোধ করি সে সময় আসেনি।

বৃদ্ধ ধর্মদাস হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, দাদা, এখনো যে মা বেঁচে আছেন!

কথাটায় কতখানি যে প্রকাশ করিল, তাহা অন্তরে উভয়েই অনুভব করিল। দেবদাসের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। সমস্ত পেট প্লীহা—লিভারে পরিপূর্ণ ; তাহার উপর জ্বর, কাশি। রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, দেহ অস্থিচর্মসার। চোখ একেবারে ঢুকিয়া গিয়াছে, শুধু একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চকচক করিতেছে। মাথায় চুল রুক্ষ ও ঋজু—চেষ্টা করিলে বোধ হয় গুনিতে পারা যায়।হাতের আঙ্গুলগুলার পানে

চাহিলে ঘৃণা বোধ হয়— একে শীর্ণ, তাহাতে আবার কুৎসিত ব্যাধির দাগে দুষ্ট। স্টেশনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথাকার টিকিট কিনব দেব্‌তা?

দেবদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, চল বাড়ি যাই—তার পর সব হবে।

গাড়ির সময় হইলে তাহারা হুগলির টিকিট কিনিয়া চাপিয়া বসিল।

ধর্মদাস দেবদাসের নিকটেই রহিল। সন্ধ্যার পূর্বে দেবদাসের চোখ জ্বালা করিয়া আবার জ্বর আসিল। ধর্মদাসকে ডাকিয়া কহিল, ধর্মদাস, আজ মনে হচ্চে, বাড়ি পৌঁছানও হয়ত কঠিন হবে।

ধর্মদাস সভয়ে কহিল, কেন দাদা?

দেবদাস হাসিবার চেষ্টা করিয়া শুধু বলিল, আবার যে জ্বর হল ধর্মদাস।

কাশীর পথ যখন পার হইয়া গেল, দেবদাস তখন জ্বরে অচেতন। পাটনার কাছাকাছি তাহার হুঁশ হইল, কহিল, তাইত ধর্মদাস, মায়ের কাছে যাওয়া সত্যিই আর ঘটল না।

ধর্মদাস কহিল, চল, দাদা, আমরা পাটনায় নেমে গিয়ে ডাক্তার দেখাই—

উত্তরে দেবদাস বলিল, না থাক, আমরা বাড়ি যাই চল।

গাড়ি যখন পাণ্ডুয়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোর হইতেছে। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছিল, এখন থামিয়াছে। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। নীচে ধর্মদাস নিদ্রিত। ধীরে ধীরে একবার তাহার ললাট স্পর্শ করিল, লজ্জায় তাহাকে জাগাইতে পারিল না। তার পর দ্বার খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। গাড়ি সুপ্ত ধর্মদাসকে লইয়া চলিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে দেবদাস স্টেশনের বাহিরে আসিল। একজন ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল, বাপু, হাতীপোতায় নিয়ে যেতে পারবে?

সে একবার মুখপানে চাহিল, একবার এদিক-ওদিক চাহিল, তাহার পর কহিল, না বাবু, রাস্তা ভাল নয়—ঘোড়ার গাড়ি এ বর্ষায় ওখানে যেতে পারবে না।

দেবদাস উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, পালকি পাওয়া যায়?

গাড়োয়ান বলিল, না।

আশঙ্কায় দেবদাস বসিয়া পড়িল—তবে কি যাওয়া হবে না? তাহার মুখের উপরেই তাহার অন্তিম অবস্থা গাঢ় মুদ্রিত ছিল, অন্ধেও তাহা পড়িতে পারিত।

গাড়োয়ান আর্দ্র হইয়া কহিল, বাবু, একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে দেব?

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণে পৌঁছবে?

গাড়োয়ান বলিল, পথ ভাল নয় বাবু, বোধ হয় দিন-দুই লেগে যাবে।

দেবদাস মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, দু' দিন বাঁচব তো? কিন্তু পার্বতীর কাছে যাইতেই হইবে। তাহার অনেকদিনের অনেক মিথ্যা কথা, অনেক মিথ্যা আচরণ স্মরণ হইল। কিন্তু শেষদিনের এ প্রতিশ্রুতি সত্য করিতেই হইবে। যেমন করিয়া হোক, একবার তাহাকে শেষ দেখা দিতেই হইবে! কিন্তু এ জীবনের মেয়াদ যে আর বেশী বাকি নাই! সেই যে বড় ভয়ের কথা!

দেবদাস গরুর গাড়িতে যখন উঠিয়া বসিল, তখন জননীর কথা মনে করিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। আর একখানি স্নেহকোমল মুখ আজ জীবনের শেষক্ষণে নিরতিশয় পবিত্র হইয়া দেখা দিল—সে মুখ চন্দ্রমুখীর। যাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া সে চিরদিন ঘৃণা করিয়াছে, আজ তাহাকেই জননীর পাশে সগৌরবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ জীবনে আর দেখা হইবে না, হয়ত বহুদিন পর্যন্ত সে খবরটাও পাইবে না। তবু পার্বতীর কাছে যাইতে হইবে। দেবদাস শপথ করিয়াছিল, আর একবার দেখা দিবেই। আজ এ প্রতিজ্ঞা তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে। পথ ভাল নয়। বর্ষার জল কোথাও পথের মাঝে জমিয়া আছে, কোথাও বা পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাদায় সমস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ি হটর হটর করিয়া চলিল। কোথাও নামিয়া চাকা ঠেলিতে হইল, কোথাও গরু দুটোকে নির্দয়রূপে প্রহার করিতে হইল—যেমন করিয়াই হোক, এ ষোল ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। হুহু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আজও তাহার সন্ধ্যার পর প্রবল জ্বর দেখা দিল। সে সভয়ে প্রশ্ন করিল, গাড়োয়ান, আর কত পথ?

গাড়োয়ান জবাব দিল, এখনো আট-দশ কোশ আছে বাবু।

শিগ্‌গির নিয়ে চল্‌বাপু, তোকে অনেক টাকা বকশিশ দেব। পকেটে একখানা এক শ' টাকার নোট ছিল, তাই দেখাইয়া কহিল, এক শ' টাকা দেব, নিয়ে চল্‌।

তাহার পর কেমন করিয়া কোথা দিয়া সমস্ত রাত্রি গেল, দেবদাস জানিতেও পারিল না। অসাড় অচেতন; সকালে সজ্ঞান হইয়া কহিল, ওরে, আর কত পথ? এ কি ফুরোবে না?

গাড়োয়ান কহিল, আরও ছয় কোশ।

দেবদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, একটু শিগগির চল্‌বাপু, আর যে সময় নেই।

গাড়োয়ান বুঝিতে পারিল না, কিন্তু নূতন উৎসাহে গরু ঠেঙ্গাইয়া গালিগালাজ করিয়া চলিল। প্রাণপণে গাড়ি চলিতেছে, ভিতরে দেবদাস ছটফট করিতেছে। কেবল মনে হইতেছে, দেখা হবে তো? পৌঁছব তো? দুপুরবেলা গাড়ি থামাইয়া গাড়োয়ান গরুকে খাবার দিয়া, নিজে আহার করিয়া আবার উঠিয়া বসিল। কহিল, বাবু, তুমি খাবে না কিছু?

না বাপু, তবে বড় তেষ্টা পেয়েচে, একটু জল দিতে পার?

সে পথিপার্শ্বস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিল। আজ সন্ধ্যার পর জ্বরের সঙ্গে দেবদাসের নাকের ভিতর হইতে সড়সড় করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে লাগিল। সে প্রাণপণে নাক চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বোধ হইল,দাঁতের পাশ দিয়াও রক্ত বাহির হইতেছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন টান ধরিয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, আর কত?

গাড়োয়ান কহিল, আর কোশ-দুই; রাত্রি দশটা নাগাদ পৌঁছব।

দেবদাস বহুকষ্টে মুখ তুলিয়া পথের পানে চাহিয়া কহিল, ভগবান!

গাড়োয়ান প্রশ্ন করিল, বাবু, অমন করচেন কেন?

দেবদাস এ কথার জবাব দিতেও পারিল না। গাড়ি চলিতে লাগিল, কিন্তু দশটার সময় না পৌঁছিয়া প্রায় রাত্রি বারোটায় গাড়ি হাতীপোতার জমিদারবাবুর বাটীর সম্মুখে বাঁধানো অশ্বত্থতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়োয়ান ডাকিয়া কহিল, বাবু, নেমে এসো।

কোন উত্তর নাই। আবার ডাকিল, তবু উত্তর নাই। তখন সে ভয় পাইয়া প্রদীপ মুখের কাছে আনিল, বাবু, ঘুমালে কি?

দেবদাস চাহিয়া আছে; ঠোঁট নাড়িয়া কি বলিল, কিন্তু শব্দ হইল না। গাড়োয়ান আবার ডাকিল, ও বাবু!

দেবদাস হাত তুলিতে চাহিল, কিন্তু হাত উঠিল না; শুধু তাহার চোখের কোণ বাহিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। গাড়োয়ান তখন বুদ্ধি খাটাইয়া অশ্বত্থতলার বাঁধানো বেদীটার উপর খড় পাতিয়া শয্যা রচনা করিল।

তাহার পর বহুকষ্টে দেবদাসকে তুলিয়া আনিয়া তাহার উপর শয়ন করাইয়া দিল। বাহিরে আর কেহ নাই, জমিদারবাটী নিস্তব্ধ, নিদ্রিত। দেবদাস বহুক্লেশে পকেট হইতে এক শ' টাকার নোটটা বাহির করিয়া দিল। লণ্ঠনের আলোকে গাড়োয়ান দেখিল, বাবু তাহার পানে চাহিয়া আছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। সে অবস্থাটা অনুমান করিয়া নোট লইয়া চাদরে বাঁধিয়া রাখিল। শাল দিয়া দেবদাসের মুখ পর্যন্ত আবৃত; সম্মুখে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, নূতন বন্ধু পায়ের কাছে বসিয়া ভাবিতেছে।

ভোর হইল। সকালবেলা জমিদারবাটী হইতে লোক বাহির হইল,— এক আশ্চর্য দৃশ্য। গাছতলায় একজন লোক মরিতেছে। ভদ্রলোক। গায়ে শাল, পায়ে চকচকে জুতো, হাতে আংটি। একে একে অনেক লোক জমা হইল। ক্রমে ভুবনবাবুর কানে এ কথা গেল, তিনি ডাক্তার আনিতে বলিয়া নিজে উপস্থিত হইলেন। দেবদাস সকলের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল— একটা কথাও বলিতে পারিল না, শুধু চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়োয়ান যতদূর জানে বলিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না। ডাক্তার আসিয়া কহিল, শ্বাস উঠেছে, এখনই মরবে।

সকলেই কহিল, আহা!

উপরে বসিয়া পার্বতী এ কাহিনী শুনিয়া বলিল, আহা!

কে একজন দয়া করিয়া মুখে একফোঁটা জল দিয়ে গেল। দেবদাস তাহার পানে করুণদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চক্ষু মুদিল। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়া ছিল, তাহার পরে সব ফুরাইল। এখন কে দাহ করিবে, কে ছুঁইবে, কি জাত ইত্যাদি লইয়া তর্ক উঠিল। ভুবনবাবু নিকটস্থ পুলিশ-স্টেশনে সংবাদ দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। প্লীহা-লিভারে মৃত্যু। মুখে রক্তের দাগ। পকেট হইতে দুইখানা পত্র বাহির হইল। একখানা তালসোনাপুরের দ্বিজদাস মুখুয্যে বোম্বায়ের দেবদাসকে লিখিতেছে—টাকা পাঠান এখন সম্ভব নয়। আর একটা কাশীর হরিমতী দেবী উক্ত দেবদাস মুখুয্যেকে লিখিতেছে—কেমন আছ?

বাঁ হাতে উলকি দিয়া ইংরাজী অক্ষরে নামের আদ্যাক্ষর লেখা আছে। ইন্‌স্পেক্টরবাবু তদন্ত করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, লোকটা দেবদাস বটে।

হাতে নীলপাথর দেওয়া আংটি—দাম আন্দাজ দেড় শ', গায়ে একজোড়া শাল—দাম আন্দাজ দুই শ'। জামাকাপড় ইত্যাদি সমস্তই লিখিয়া লইলেন। চৌধুরীমহাশয় ও মহেন্দ্রনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তালসোনাপুর নাম শুনিয়া মহেন্দ্র কহিল, ছোটমার বাপের বাড়ির লোক, তিনি দেখলে—

চৌধুরীমহাশয় তাড়া দিলেন, সে কি এখানে মড়া সনাক্ত করতে আসবে নাকি?

দারোগাবাবু সহাস্যে কহিলেন, পাগল আর কি!

ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও, পাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না; কাজেই চণ্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তার পর কোন শুষ্ক পুষ্করিণীর তটে অর্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল—কাক-শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল- কুক্কুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তবুও যে শুনিল, সেই কহিল, আহা! দাসী-চাকরও বলাবলি করিতে লাগিল, আহা ভদ্দরলোক, বড়লোক! দু'শ' টাকা দামের শাল, দেড় শ' টাকা দামের আংটি! সে-সব এখন দারোগার জিম্মায় আছে; পত্র দু'খানাও তিনি রাখিয়াছেন।

খবরটা সকালেই পার্বতীর কানে গিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই আজকাল সে মনোনিবেশ করিতে পারিত না বলিয়া ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সকলের মুখেই যখন ঐ কথা, তখন পার্বতীও বিশেষ করিয়া শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যার পূর্বে একজন দাসীকে ডাকিয়া কহিল, কি হয়েচে লা? কে মরেচে?

দাসী কহিল,আহা, কেউ তা জানে না মা! পূর্বজন্মের মাটি কেনা ছিল, তাই মরতে এসেছিল। শীতে হিমে সেই রাত্রি থেকে পড়ে ছিল, আর বেলা ন'টার সময় মরেচে।

পার্বতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আহা, কে তা কিছু জানা গেল না?

দাসী বলিল, মহেনবাবু সব জানেন, আমি অত জানিনে মা।

মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনা হইলে সে কহিল, তোমাদের দেশের দেবদাস মুখুয্যে।

পার্বতী মহেন্দ্রর অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া, তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে, দেবদাদা? কেমন করে জানলে?

পকেটে দু'খানা চিঠি ছিল; একখানা দ্বিজদাস মুখুয্যে লিখেচেন—

পার্বতী বাধা দিয়া কহিল, হাঁ, তাঁর বড়দাদা।

আর একখানা কাশীর হরিমতী দেবী লিখেচেন—

হাঁ, তিনি মা।

হাতের উপর উলকি দিয়ে নাম লেখা ছিল—

পার্বতী কহিল, হাঁ, কলকাতায় প্রথম গিয়ে লিখিয়েছিলেন বটে—

একটা নীল রংয়ের আংটি—

পৈতার সময় জ্যাঠামশাই দিয়েছিলেন। আমি যাই—, বলিতে বলিতে পার্বতী ছুটিয়া নামিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ও মা, কোথা যাও?

দেবদার কাছে।

সে তো আর নেই—ডোমে নিয়ে গেছে।

ওগো, মা গো! বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী ছুটিল। মহেন্দ্র ছুটিয়া সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, তুমি কি পাগল হলে মা? কোথা যাবে?

পার্বতী মহেন্দ্রর পানে তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, মহেন, আমাকে কি সত্যি পাগল পেলে? পথ ছাড়।

তাহার চক্ষের পানে চাহিয়া, মহেন্দ্র পথ ছাড়িয়া নিঃশব্দে পিছনে পিছনে চলিল। পার্বতী বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখনও নায়েব গোমস্তা কাজ করিতেছিল, তাহারা চাহিয়া দেখিল। চৌধুরীমহাশয় চশমার উপর দিয়া চাহিয়া কহিলেন, যায় কে?

মহেন্দ্র বলিল, ছোটমা।

সে কি? কোথায় যায়?

মহেন্দ্র বলিল, দেবদাসকে দেখতে।

ভুবন চৌধুরী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি, ধর—ধর—ধরে আনো ওকে। পাগল হয়েচে! ও মহেন, ও কনেবৌ!

তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পার্বতীর মূর্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। পরদিন তাহার মূর্ছাভঙ্গ হইল, কিন্তু সে কোনো কথা কহিল না। একজন দাসীকে ডাকিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিতে এসেছিলেন, না? সমস্ত রাত্রি!

তাহার পর পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে-কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মতো দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনো দেবদাসের মতো এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মতো এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহ-করস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।

সমাপ্ত

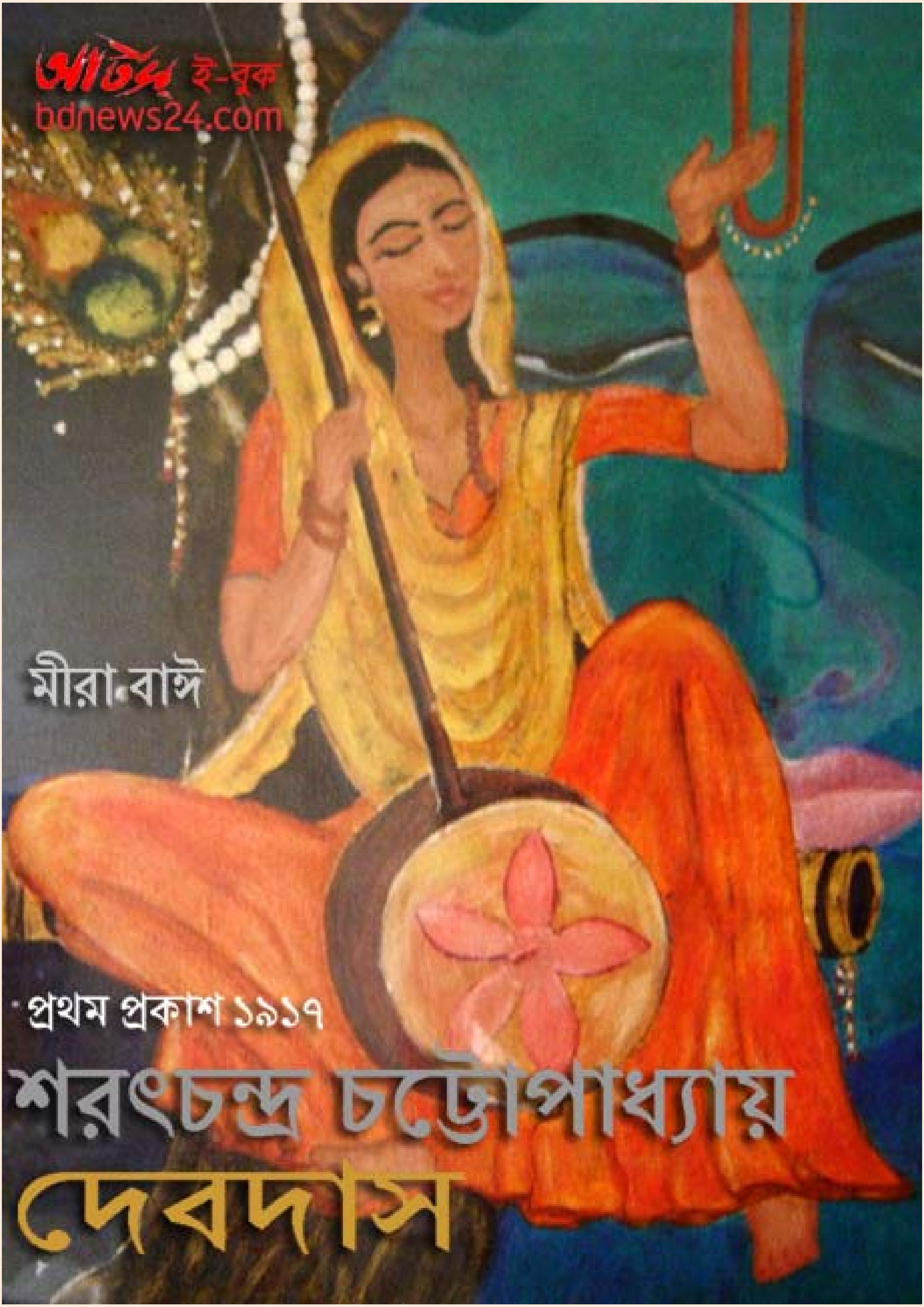

আর্টস ই-বুক
bdnews24.com

মীরা বাঈ

প্রথম প্রকাশ ১৯১৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেবদাস